নিবেদন

এই গ্রন্থের গল্পটি আমার। কিন্তু বনের খবর আহরণ করেছি চারখানি বিলাতী পুস্তক থেকে। যাদের জন্য গ্রন্থখানি রচিত হল, তাদের যদি ভাল লাগে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৪১ } গ্রন্থকার

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়

করকমলেষু

ব্রেজিলের বন

ব্রেজিল দেশের নাম হয়ত তোমরা শুনেছ। তোমাদের কারো কারো চোখে ব্রেজিল পাথরের দামী চশমাও আছে। কিন্তু সেখানকার নদী, বন, পর্ব্বতের গল্প ক'জন জান? তোমরা দুধ-গাছের নাম শুনেছ কি? রক্ত-চোষা পাখীর খবর বল্‌তে পারো? আর তার গহন বনে রাক্ষসরা আজও যে—আচ্ছা এখন থাক্‌। একে একে সব বল্‌ছি। গল্পটা শোনবার আগে আমেরিকার ম্যাপখানা খুলে দেখ।

ব্রেজিলের বন

ঐ যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে পানামার খাল,—পৃথিবীর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। ঐ খালের দক্ষিণে ব্রেজিল প্রদেশ। তার চারধারেই পাহাড়। পশ্চিমে আন্দিজ পর্ব্বতমালা ; ওরই এক অংশে স্ফটিকপাথর পাওয়া যায়। সেই পাথর থেকেই চশমা তৈরী হয়ে থাকে। দেশটার বুকের ওপর দিয়ে শিরা-উপশিরার মত জলভরা ছোট-বড় অসংখ্য নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ নদী আমেজন বা ওরিনোকো, ঐ দেখ আন্দিজ পাহাড়-মালা থেকে নেমে এঁকে-বেঁকে, ক্রমে মোটা হয়ে, প্রস্থে আমাদের মেঘনাকেও হারিয়ে, সাগরের মত গভীর হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। নদীটার শাখা-উপশাখাই বা কত! ওর দুটি তীরে গহন বন। সে বন এমন গভীর যে দিনের বেলাতেও কোথাও কোথাও অন্ধকার, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। ওর মধ্যে কত রকম ফল-ফুলের বৃক্ষ-লতা যে জোট পাকিয়ে বনটাকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছে কি বলব! ওই বনেই রবারের গাছ আছে ; আবার জংলীদেরও বাসা। তারা সব ভিন্ন ধাতের মানুষ, পোষাক-পরিচ্ছদের ধার-ধারে না ; হাতে-

পায়ে-গায়ে-সারামুখে কেটে-কুটে বীভৎস উল্কী পরে। তাদের খাবারের বাছ-বিচার নেই, মনে ভয়-ডরও কম। বনে বনে পশু-পক্ষী শিকার করে বেড়ায়, নদী-খালে নানা রকম মাছ ধরে, আর, পাতার কুঁড়ে বেঁধে ছেলেপুলে নিয়ে মহাসুখে দিন কাটায়। কেউ কেউ অবশ্য ইউরোপীয়দের পাল্লায় পড়ে আজকাল সভ্যও হয়ে পড়ছে।

যাক্ এইবার শোন গল্পটা—

বৎসর কয়েক আগের কথা। একদিন এক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী আমেজন নদী-পথে উজিয়ে চলেছেন। তাঁদের নৌকোখানা বেশী বড় নয়; আমাদের দেশের পান্সীর মত। সঙ্গে একটি চাকর আর নৌকোর জনকয়েক মাঝি-মাল্লা। তিনি চলেছিলেন, অনেক দূরে, যেখানে কোন সভ্য মানুষ এ পর্য্যন্ত যায় নি। তাঁর আশা, যদি বনের কোন অংশে প্রচুর লাভ করবার মত দামী কাঠের সন্ধান পাওয়া যায়।

বণিক মশায় দেখ্তে দেখ্তে চলেছেন—

নদীর দু ধারে সুগভীর বন। তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাঠ ও জলাভূমি; কোথাও বা বহু দূর

থেকে বনের মধ্য দিয়ে অন্য নদী এসে আমেজনে মিশেছে। সকাল-সন্ধ্যায় নানা রকম বনচারী জন্তু নদীতে জল খেতে আসে ; মাথার ওপর দিয়ে কত রকমের পাখী উড়ে যায় ; নৌকোর চারধারে নানা রকম মাছ, বড় বড় কুমীর ও কাছিম ভেসে ওঠে, কিন্তু কোথাও কোন মানুষের দেখা পাওয়া যায় না।

বণিক মশায় অধীর হয়ে উঠ্‌লেন।

এ অঞ্চলটা তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। মাঝি-মাল্লারাও এদিকে কখন আসে নি। সকলেরই কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগ্‌ল। তবু পয়সা উপার্জ্জনের জন্যে কষ্ট করতে হবে বৈ কি ? তিনি চুপ্‌ করে ছইয়ের ওপর বসে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে তীরস্থ জনহীন বনের গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এমনি করে সাতটা দিন কেটে গেল।

অষ্টম দিনে তাঁরা দেখতে পেলেন, সাম্‌নে নদীর দক্ষিণ ধারে জলে মোটা ডালের মত একটা কি ভাস্‌ছে। বণিক মশায় জিজ্ঞাসা করলেন "ঐ ওটা কি ? দেখ দেখ মাঝি—"

মাঝি বল্‌লে—"এ্যানাকোণ্ডা সাপ—"

তিনি চুপ্ করে ছইয়ের ওপর বসে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে তীরস্থ জনহীন বনের গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

"উঃ কত বড় ! প্রায় হাত পঁচিশেক কি তারও বেশী লম্বা হবে। কিন্তু জলে ভাসছে কেন ?"

মাঝি বল্লে—"ওরা জলেই থাকে। শিকার ধরে, কূলের কাছে সারা শরীর জলে ডুবিয়ে কেবল মুখটা বার করে রেখে। সাপগুলো গরু, ঘোঁড়া, মানুষ—সব খায়। আমার এক আত্মীয় ঐ সাপের পেটে গিয়েছে।"

"ওকি ! ওটা নড়ছে না ত !"

"তাইত ! মরে গেছে দেখ্‌ছি।"

"সাপটার পেটটা কি ফুলো।"

"হয়ত কোন মানুষ খেয়েছে—"

"মানুষ ? মানুষ কোথা পাবে ?"

"ঐ যে—" —মাঝির কথায় সকলে দেখলেন দূরে একখানা ক্যানো। তাতে দুজন জংলী। তাদের দুজনেরই মাথায় ঝাঁকড়া চুল, শরীর বেশ বলিষ্ঠ, মুখ-চোখের চেহারাও খারাপ নয়; কিন্তু কারো পরণে কাপড় নেই। নৌকোর ওপর যে ভাবে নিশ্চল হয়ে আছে, তাতে মনে হচ্ছে, মাছ ধরছে।

আমেজন নদীতে মাছ পাওয়া যায় নানা-রকমের। এক রকম মাছ শূকরের মত ডাকে; কিন্তু তাই বলে তার মাংস ও চেহারা ঐ নোংরা স্থলচর প্রাণীটার মত নয়। আর, জংলীরা তা ধরে পোষেও না। বিদকুটে শূকর-মাছ ছাড়া পাঁচ-ছ হাত লম্বা লাল-মাছও পাওয়া যায়। লাল-মাছগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন চমৎকার! বণিক মশায় একদিন হাতসূতো দিয়ে একটা লালমাছ ধরেছিলেন। সেটা লম্বায় হাত তিনেক হবে। তত বড় মাছ চৌবাচ্চা বা কাচের জারে রাখা চলে না। আবার একদিন দেখেন, একটা তাপীর—গণ্ডারের জাত ভাই কিন্তু আকারে ছোট—সন্ধ্যার দিকে নদীতে জল খেতে এসে প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পায় না। জলে মুখ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রাক্ষুসে-মাছ তার ঠোঁট কাম্‌ড়ে ধর্‌লে। এ মাছগুলোর রীতিই এই, কেবল ঠোঁট কামড়ে ধরে। আর, এমন হ্যাঙ্গ্‌লা যে একটা ঘোড়া কি মহিষের মত প্রাণীর মৃতদেহ যদি পায় ত এক ঘণ্টার মধ্যে তার সব খেয়ে কেবল হাড় ক'খানা ফেলে রাখে!

জংলীরা কি ধর্‌ছে ? যাই ধরুক, সাবধান হওয়া দরকার। কেননা জংলীর রক্ত চট্‌ করে গরম হয়ে উঠ্‌তে পারে। তাঁরা সকলে ছইয়ের নীচে থেকে রাইফেলগুলো এনে গুলিভরে হাতের কাছে রাখলেন।

ওদিকে জংলী দুটোও ততক্ষণে তাঁদের দেখতে পেয়েছে। জলের ধারেই ঘন ঝোপ ; তার পাশের একটা প্রকাণ্ড গাছের পাতাঘন কয়েকটা ডাল জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তারা ক্যানো নিয়ে তীর বেগে তার আড়ালে লুকিয়ে পড়্‌ল।

তারপরই শব্দ শোনা গেল—দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌। জংলীরা গাছের ফাঁপা গুঁড়ি বাজাচ্ছে। সে শব্দ প্রায় দু মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। ওটা হ'ল ওদের টেলিগ্রাফ। দূরের জংলীরা সে শব্দ শুনে বুঝ্‌তে পারে, বিদেশী এসেছে বা একটা কিছু ঘটেছে। আবার তারাও গুঁড়ি বাজায়। তাদের দুম্‌-দুম্‌-দুম্‌ শব্দ শুনে আবার আর এক জংলীদের আড্ডায় গুঁড়ি বেজে ওঠে—দুম্‌-দুম্‌-দুম্‌। এমনি করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে খবরটা বিশ-পঁচিশ ক্রোশ

দূরে চারিদিকে জংলীদের আড্ডায় আড্ডায় ছড়িয়ে পড়ে, আর, সকলে সাবধান হয়।

বণিক মশায় বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠ্লেন—"ভাল জ্বালা! ছিলুম ভাল। আবার এক উৎপাৎ দেখা দিল দেখ্ছি।"

মাঝি বল্লে—"সন্ধ্যে হয়ে আস্ছে। সামনে অন্ধকার রাত; আর এগিয়ে যাওয়া বিপদের—"

"কিন্তু কূলেই বা বাঁধ্বে কোথা?"

সম্মুখে কিছু দূরে নদীর বাঁ দিকে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাদাম গাছ পড়েছিল। ব্রেজিল বাদামের গাছ উঁচুতে প্রায় ১৩০ ফিট্ হয়। সে বাদাম ত লোকে খায়ই, তা থেকে আবার তেল হয়। এ তেল তোমরা ঘড়ি মেরামতের দোকানে দেখ্তে পাবে। ঘড়িতে এই তেলই দেওয়া হয়ে থাকে। সে জায়গাটা দয়ের মত; স্রোত অল্প। তীরে গাছ-পালাও ফাঁকা ফাঁকা।

মাঝি বল্লে—"ঐ গাছের সঙ্গে নৌকো বাঁধা যাক্।"

বণিক মশায় বাইনাকুলার দিয়ে চারিদিক বেশ

করে দেখে বল্লেন—"মন্দের ভাল বটে কিন্তু জংলা দুটো বিপরীত দিকে,—আরে, ঐ যে ওপারে ঝোপের মধ্যে বসে ওরা আমাদের লক্ষ্য করছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচজন। সকলের হাতে তীর-ধনুক আর বর্শা—"

মাঝি-মাল্লারা আধা-জংলী। তারা জংলী ভাষাও কিছু জান্‌ত। নদীটা সেখানে গভীর কিন্তু বেশী চওড়া নয়; এ পারে চীৎকার করলে ওপারে স্পষ্টই শোনা যায়। তার ওপর সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে।

মাঝি বল্‌লে—"কর্ত্তা, একবার ওদের সাড়া নেওয়া যাক্।" বলে হাঁক ছাড়্‌লে।

সেই হাঁকের সঙ্গেই জংলীরাও বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বণিক মশায় বল্‌লেন—"আর কাজ নেই; ঐখানেই বাঁধ।"

সেই গাছের একটা ডালের সঙ্গে নৌকো বাঁধা হ'ল। আর অমনি তীর থেকে কালো ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্ষুদে মশার ঝাঁক মিহিসুরে গান গাইতে গাইতে এসে তাঁদের ঘিরে ধরলে। এ

মশাগুলো এত ছোট যে কোন মশারীতেই এদের আটকানো যায় না। কামড়ালে ম্যালেরিয়া অনিবার্য্য। সকলে বেশ করে মুড়ি দিয়ে বস্‌ল।

বণিক মশায়ের চাকর ষ্টোভ জ্বেলে রান্না চড়িয়ে দিলে; মাঝিরাও রান্নার জোগাড় করতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যা বেশ ঘোর হয়ে এসেছে। আমেজনের গভীর জল কালো হয়ে উঠ্‌ল। আকাশে অসংখ্য তারা ঝিক্ ঝিক্ করছে, জলে তার ছায়া। দূরে বনের এক ধারে শিয়াল ডেকে উঠ্‌ল। তেপান্তরের মাঠে বা নির্জ্জন নদী তীরে শিয়ালের ডাক মন্দ লাগে না কিন্তু মশার কামড়ে সকলে অস্থির। বণিক মশায়ের সঙ্গে গ্রামোফন ছিল। যন্ত্রণা কমাবার জন্যে তিনি তাতে রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন। রেকর্ডে ব্যাণ্ড বাজতে লাগ্‌ল নাচের সুর—খ্যাঁ-খ্যাঁ—কোঁ-কোঁ—।

কিছুক্ষণ ধরে বাজনা চলেছে, ষ্টোভে রান্নাও হচ্ছে। এমন সময় সকলে দেখ্‌তে পেলেন, নদীতে ছায়ার মত কয়েকখানা ক্যানো! ক্যানোগুলো একেবারে তাঁদের কাছে এসে পড়েছে। সঙ্গে তেজী টর্চ্ ছিল। সেই দিকে ঘুরিয়ে তাঁরা যা দেখ্‌লেন,

বণিকমশায়ের সঙ্গে গ্রামোফন ছিল। যন্ত্রণা কমাবার জন্যে তিনি তাতে রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন।

তাতে সকলের চক্ষুস্থির। তীর-ধনুক-বর্শা ও নলধারী একপাল জংলী। কারো কারো হাতে আবার বন্দুক। কিন্তু বন্দুকের চেয়েও মারাত্মক ঐ নলগুলো। সরু ফাঁপা বাঁশের মধ্যে খুব হাল্‌কা বিষ মাখানো তীর থাকে। নিশানা করে গোড়ার দিকে মুখ লাগিয়ে খুব জোরে ফুঁ দিলেই তীরটা সোঁ করে বেরিয়ে গুলীর মত শত্রুর শরীরে বিদ্ধ হয়। ঐ এক তীরেই সে বেচারী কাবার। নলধারী জংলীদের সঙ্গে বন্দুকধারী সৈন্যদের একবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। শেষে অবশ্য জংলীরা পারে নি; কিন্তু প্রথমে ওদের ফুঁকো-তীরের মুখে অনেক সৈন্যকে প্রাণ হারাতে হয়। বণিক মশায়ের অবশ্য যুদ্ধ করবার ইচ্ছে নেই। তবুও আত্মরক্ষার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হলেন। গ্রামোফন থেমে গেল, ষ্টোভ নিভে গেল, সকলের হাতে গুলীভরা বন্দুক ও টর্চ্।

বণিক মশায় টর্চের আলো জংলীদের ওপর ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাও?"

জংলীরা এর আগে কখনও টর্চ্ দেখে নি। তাদের মুখে তেজী আলো পড়্তেই তারা হতভম্বের মত হয়ে

গেল। কেউ কেউ একহাতে চোখ ঢাক্‌লে, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, কারো চোখ ছোট হয়ে এল। তাদের মধ্যে যে লোকটা হাল-ধরে অন্ধকারে বসেছিল, সে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমরা কে ?"

"বণিক—"

"কোথা যাবে ?"

"অনেক দূরে —"

তারপর সব চুপ্‌। ততক্ষণে ক্যানোগুলো আরও সরে এসেছে ; কিন্তু একেবারে কাছে এল না, কিছুদূরে সার বেঁধে রইল।

বণিক মশায় বল্‌লেন—"আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। তোমরা যদি কিন্‌তে চাও দিতে পারি।"

জংলীরা খুব বন্দুক পছন্দ করে। অনেক সময় দামী জিনিষের বদলে কম দামের গাদা-বন্দুক নিয়ে থাকে।

তবুও তারা কোন উত্তর দিলে না। কিছুক্ষণ পরে একজন বললে, "আচ্ছা, দাও—"

বণিক মশায়ের ইচ্ছা অন্ততঃ রাতখানা কোন রকমে তাদের ঠেকিয়ে রাখেন। বল্‌লেন—"কিন্তু

বণিকমশায় টর্চের আলো জংলীদের ওপর ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি চাও ?"

রাতের বেলা দেখে-শুনে দেওয়া বা নেওয়া সুবিধে হবে না। দু একটা বন্দুকের নল ফেটে গেছে। এই আলোতে তা দেখা যাবে না। দিনের বেলাতেই ভাল। কি বল?”

আবার সব চুপ্। চাকরটা বণিক মশায়ের কানে কানে বললে—“ওরা পরামর্শ করছে।”

জংলীরাও কম চতুর নয়। উত্তরে মুখে বললে —“বেশ।” এবং তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে গা ঢাকা দিলে। কিন্তু সকলে ওপারে ফিরে গেল না; একখানা নৌকো বণিকমশায়দের কাছ থেকে কিছু দূরে দয়ের বাইরে ঘন বাঁশবনের অন্ধকারে লুকিয়ে রইল।

তারা চলে যেতেই আবার গ্রামোফোনে গান সুরু হল, ষ্টোভে মাংস সিদ্ধ হতে লাগ্‌ল। কিন্তু কেউ হাত থেকে বন্দুক নামালেন না।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে মুড়ি-শুড়ি দিয়ে সকলে শুয়ে পড়ল; কেবল জেগে রইল একজন। প্রহরে প্রহরে পাহারা না দিলে এ বনরাজ্যে কি রক্ষা আছে?

রাত ক্রমে গভীর হয়ে এল। বনে থেকে থেকে জাগুয়ার ডাক্‌ছে, দূরে পিউমা গর্জ্জন করছে। নদীতে মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ সশব্দে লাফিয়ে ওঠে। একটা মানুস-খেকো কুমীর নৌকোর চারধারে ঘোরা-ঘুরি করছিল। নৌকার গায়ের সঙ্গে এক একবার তার ধাক্কা লাগে; সেই ধাক্কায় নৌকো দুলে ওঠে। কিন্তু আমেজনের ছল্ ছল্ শব্দ, আর, কানের কাছে অসংখ্য ক্ষুদে মশার মিহি সুরে গান সমানে চলেছে। প্রথম দিকে পাহারায় বসেছিল মাঝি। সে একটা কড়া চুরুট্ টানতে টান্‌তে কান খাড়া করে সব শুন্‌ছে আর মাঝে মাঝে টর্চ্ ঘুরিয়ে চারধার দেখ্‌ছে।

কিছুক্ষণ পরে তার একবার মনে হ'ল যেন বৈঠার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে সতর্ক হয়ে কান পেতে রইল, টর্চ্‌টাও তুলে ধরলে। নাঃ, কিছুই না, আমেজনের জলধারার শব্দ।

সে হাতঘড়িতে দেখ্‌লে, রাত ঠিক বারোটা। এবার একজন মাল্লার পালা। সে তাকে ঠেলে তুলে পাহারায় বসিয়ে ছইয়ের এককোণে মুড়িশুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাল্লাটাও সজাগ ও সশস্ত্র বসে আছে। কিন্তু তার দুচোখে তখনও ঘুম মাখানো। এক একবার ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসে, ঢুলে পড়ে। আবার নৌকোর মাস্তুলের গায়ে মাথা ঠুকে চমকে জেগে ওঠে। কয়েকবার এমনি করে সে একবার সটান শুয়ে পড়ল। রাজ্যের ঘুম যেন তার চোখে নেমে এসেছে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, তা জানে না, কিন্তু যখন চোখ মেল্‌লে, দেখে তার হাত-পা বাঁধা! তার সঙ্গীদেরও সেই অবস্থা। নৌকোর ওপর যমদূতের মত আটদশটা জংলী। নৌকোখানা এপাশে-ওপাশে খুব দুলছে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। আন্দাজে মনে হয়, তাদের নৌকো ভেসে চলেছে। সকলেই অবাক!

জংলীদের এমন হঠাৎ আক্রমণের কারণ কি, বণিক মশায়রা বুঝ্‌তে পারলেন না। শহর ছেড়ে, সভ্য লোকের রাজ্য বহুদূরে ফেলে তাঁরা এতখানি পথ এসেছেন। এর মধ্যে কারো সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় নি, কারো প্রতি তাঁদের শত্রুতাও ছিল না। তবে? বণিকমশায় ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত করলেন,

কতকটা জংলীদের স্বভাব, আর, কতকটা তাদের প্রতি সভ্য মানুষদের দুর্ব্ব্যবহার এর কারণ। এখন কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়? জোর করবার উপায় নেই, কেন না, হাত-পা বাঁধা। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা ছাড়া উদ্ধারের আর পথ নেই। ওরাও মানুষ, ওদেরও মন আছে, ভাল কথায়, ভাল ব্যবহারে কে না বশ হয়?

তিনি তাদের সর্দ্দারকে উদ্দেশ করে বল্লেন—"সর্দ্দারজি, আমরা তোমাদের অতিথি। মনে করেছিলুম, তোমাদের এখানে আমাদের কোন বিপদ হবে না। কিন্তু তার বদলে—"

বণিক মশায়ের কথাগুলো অবশ্য মাঝি জংলী ভাষায় রূপান্তরিত করে বল্লে।

সর্দ্দার উত্তর করলে—"কাল সকালে সব জান্তে পারবে।"

এদিকে রাত শেষ হবারও দেরী ছিল না। আমেজানের বুকের ওপর দিয়ে ভোরের মিঠে বাতাস ঝির্ ঝির্ করে বয়ে চলেছে। বনের মধ্যে দূরে শেষ প্রহরে শিয়াল ডেকে উঠ্ল। পূব আকাশে

মণিমালার মধ্যমণির মত শুক তারাটি ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বল্‌ছে। বন্দীদের নৌকো ওপারে পৌঁছল। তাদের নৌকোর চার ধারে সশস্ত্র প্রহরীর মত চারখানা ক্যানো।

অন্ধকার ভাঙা ঘাট। জলের ওপর গাছ-পালা, ঝোপ্‌ঝাড় নুয়ে পড়েছে। বন্দীরা সকলেই ভাব্‌ছে, আর বাঁচবার উপায় নেই। হয়ত কাল সকলকে এরা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে চারদিকে আগুন জেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে, কিম্বা হাত-পা বেঁধে চীৎ করে ফেলে বুকের ওপর জ্বলন্ত কয়লা চেপে ধরবে; অথবা জীবন্ত অবস্থাতেই মাথার খুলি ভেঙে ঘিলু বার করে নেবে!

বণিকমশায়ের পাশেই তাঁর চাকর পড়েছিল। সে চুপি চুপি ডাক্‌লে—"কর্ত্তা—"

বণিকমশায় উত্তরে পা দিয়ে তাকে একটা ঠেলা দিলেন।

"এখন উপায়?"

"চুপ্—"

নৌকো ও ক্যানোগুলো কূলে লাগতেই জংলীরা

বন্দীদের নামিয়ে নিলে। তাদের জিনিষপত্র যা ছিল, সব লুঠপাট হয়ে গেল।

সর্দ্দার হাঁক দিলে—“খবরদার, এদের যা কিছু সব আমার। কেউ নিতে পারবে না।”

কিন্তু কে তার কথা শোনে? ঐ দলের মধ্যে একটা জংলী ছিল, তার গায়ে খুব জোর। লোকটার বাপ-ঠাকুরদাদা বিখ্যাত চোর ও জোয়ান ছিল। কিন্তু বংশে কিছু নীচু বলে সর্দ্দার হতে পারেনি। বর্ত্তমান সর্দ্দারের বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে তাদের কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ হ'ত। সর্দ্দারের দলভারী ছিল তাই পেরে উঠ্‌ত না। তাদের ছেলেদের মধ্যেও সেই বিবাদ রয়েছে। সুবিধা পেলেই দুজনে ক্ষেপে ওঠে।

আজকে এমন সব মজার জিনিস—বন্দুক, টর্চ্, ছুরি, গ্রামোফন, চুরুট্, চা, পোষাক-পরিচ্ছদ—কি এক কথায় ছাড়া যায়? সর্দ্দারের হুকুম কে শুন্‌বে? দু চারজন ছাড়া তার দলের লোকেই তা অমান্য কর্‌লে। সেই জোয়ান লোকটা হয়ে পড়ল বিদ্রোহীদের সর্দ্দার। বিদ্রোহী-সর্দ্দার স্পষ্ট জানালে—“ফেরৎ দেব না। এ সব আমাদের—”

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। সন্ সন্ শব্দে তীর চলে, বর্শা চলে—কেউ কেউ নল ফুঁকছে, কুড়ুল চালাচ্ছে।

বণিক মশায় সুযোগ বুঝে তার দলে ভীড়ে পড়লেন। শুয়েশুয়েই বল্‌লেন—"ও সবগুলো আমরা ওকে দিলুম—"

এতে আসল সর্দ্দারের বড় অপমান বোধ হ'ল। তার যত রাগ সব গিয়ে পড়ল বিদ্রোহী-সর্দ্দারের ওপর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। সন্‌ সন্‌ শব্দে তীর চলে, বর্শা চলে,—কেউ কেউ নল ফুঁক্‌ছে, কুড়ুল চালাচ্ছে। যোদ্ধাদের হুঙ্কার, চীৎকার ও আর্ত্তনাদে কান পাতবার যো নেই। যুদ্ধের মাঝখানে কোথা থেকে আরও জন পঞ্চাশ-ষাট জংলী এসে দুই দলে ভীড়ে গেল। কারো বুকে তীর বিঁধছে, কারো মাথাটা পাকা তালের মত গর্দ্দান থেকে ধপ্‌ করে খসে মাটিতে পড়ছে; কেউ বর্শার ঘায়ে ভয়ানক আহত হয়ে মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ছে, যেন গোড়া-কাটা কলাগাছ। চারদিকে মাটিতে, ঘাসে বনে, গাছের পাতায় তাজা তপ্ত রক্ত! বণিক মশায়রাও সেই সুযোগে নিজেদের বাঁধন কাটতে ব্যস্ত—"কাট—কাট—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির।"

বন্দুক, টর্চ্‌, গুলিবারুদ, ছুরি, কম্পাস্‌ প্রভৃতি

চারদিকে পড়ে। তাঁরা সকলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে মুক্ত হয়ে সেগুলো সব কুড়িয়ে নিলেন। লড়াই তখনও চলেছে।

"পালাও—পালাও—নৌকোয় চল।"

কিন্তু কোথায় নৌকো? ক্যানোগুলো কৈ? তাঁরা এদিকে, ওদিকে, সেদিকে খোঁজেন। যাঃ! সব লুকিয়ে রেখেছে? বণিক মশায় বললেন—"না পাওয়া গেল নৌকা। হেঁটেই চল।"

সকলে বণিকমশায়ের পিছনে পিছনে বিপরীত দিকে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

---

(২)

গভীর বন। বহুক্ষণ ভোর হয়ে গেছে, কিন্তু চারদিকে ঘন পাতার ভার ভেদ করে একটু আলোও নীচে পড়তে পারে নি, কেবল পাখীর কলরবে চারধার ভরপুর। বণিক মশায়রা সারি বেঁধে চলেছেন। ওদিকে যুদ্ধের কি হ'ল তার খবরও জান্‌বার উপায় নেই। চল্‌তে চল্‌তে কয়েকবার যোদ্ধাদের চীৎকার শুনতে পেয়েছিলেন বটে কিন্তু এখন আর কিছু শোনা যায় না। তাঁরা প্রায় ক্রোশ দেড়েক পথ পার হয়ে এলেন। তবুও ভয় হয়, এই বুঝি কোন জংলীর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে পড়ে।

"আরও একটু জোরে চল—" বলে বণিক মশায় সকলকে উৎসাহিত কর্‌লেন। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে আর এগোতে পারলেন না। পাতার মধ্যে খড়্ খড়্ শব্দ হচ্ছে!

"সাবধান, র‍্যাট্‌ল্ সাপ! ভয়ানক বিষ—"

চাকরটা চেঁচিয়ে উঠল—"ঐ যে আমাদের দিকেই আস্‌ছে। কি শয়তানের মত চোখ!"

"ঘুরে চল—"

সকলে সাপটাকে একপাশে রেখে এগিয়ে চল্‌ল।

সামনেই গোটা দুই দুধ-গাছ ছিল। ওর ডাল ভাঙ্‌লে, গা কাট্‌লে দুধের মত সাদা রস বার হয়। সে রসে ঠিক দুধের গুণ না থাকলেও তা বেশ পুষ্টিকর। এতে ক্ষীর হয়, চাচিও জমে। জংলীরা গাছগুলোকে বড় যত্ন করে। বণিক মশায়রা গাছ থেকে দুধ নেবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সঙ্গে দুটো মগ ছিল। গাছটার গা কেটে মগ দুটো সেখানে ধরা হল। ক্রমে সে দুটো দুধে ভরে ছাপিয়ে গেল। সকলে তাই দিয়ে একটু একটু গলা ভিজিয়ে নিলেন। তবে বণিক মশায় খেলেন কিছু বেশী। তিনি সর্দ্দার যে!

চাকরটা বললে—"কর্ত্তা, এগাছের একটা চারা নিয়ে গেলে কেমন হয়? উঠোনে পুঁতে দেব—গোয়াল সাফ করে ত আর পারি না।"

বণিক মশায় তাকে এক ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন, "বেটা,

মরি কি বাঁচি তার নেই ঠিক, ও আবার গাছের বাছুর সঙ্গে নিচ্ছে। চল্—চল্—"

সকলে জোরে চল্‌তে লাগলেন। চল্‌তে চল্‌তে দেখেন গাছে গাছে কাঠবেরালী ঘূর ঘূর করছে। ইঁদুরের মত ছোট ছোট অপোসাম—ঐ যে পিঠে গোটা কয়েক বাচ্চা নিয়ে ছুটে পালাল। বাচ্চাগুলো কেমন লেজ দিয়ে মায়ের লেজ আঁকড়ে ধরেছে! বণিক মশায়ের চাকরটা এ সব দেখেনি। তার বড় আনন্দ। সে একটা ধরতে ছুট্‌ল। কিন্তু ধরা কি সহজ!

তাঁরা ত পালাচ্ছেন। কিন্তু কোথায়? বণিক মশায় ভাবলেন—আর কাজ নেই, বনের কাঠ বনেই থাক্, এখন প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফেরা যাক্। পথ তাঁদের জানা নেই বটে, তবে কম্পাস দেখে চল্‌তে চল্‌তে দেশে গিয়ে একদিন পৌঁছবেনই।

"কি বল হে তোমরা?"

সকলে এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "ভাল কথা। কিন্তু খাব কি?"

"বনের ফলমূল, পশু-পক্ষী, গাছের দুধ—"

"বেশ—"

এ জায়গাটার বন এত ঘন, দুহাত দূরে কি আছে দেখা যায় না। বণিক মশায় চলেছেন সকলের আগে।

হঠাৎ তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন। সম্মুখে একটা আরমাডিলো। তার গায়ে কঠিন আঁশ। জন্তুগুলো ভয় পেলে শরীরের ঐ খোলার মধ্যে লুকিয়ে গোল হয়ে যায়—আমাদের রংপুরের বনরুইয়ের মত। ঐ আঁশগুলো যেন ওদের শরীরের বর্ম্ম। আরমাডিলোরা পোকামাকড়, পচা মাংস খায়। কিন্তু এদের মাংস খেতে চমৎকার! বণিক মশায় আর অপেক্ষা না করে, দুম্‌ করে একগুলি করলেন। ব্যাস! বেচারার দফারফা। তারপর সেখানে ভোজের আয়োজন সুরু হল। ক্ষিদের জ্বালায় পোড়া মাংসই মোগ্‌লাই কারীর মত সুন্দর লাগল।

আবার সকলে চলেছে। বেলা অনেক। এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর আবার খর রৌদ্র। রণক্ষেত্র সেখান থেকে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ। সামনেই একটা জলা। এক জোড়া ক্যাপিবরা তার

মধ্যে মনের আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে। এরা ভীরু জানোয়ার। কিন্তু শরীর বেশ মোটা-সোটা, গায়ে ঝাঁকড়া কটা লোম। বণিক মশায়দের দেখেই ক্যাপিবরা ছুটো সারা শরীর জলে ডুবিয়ে কেবল নাকের ডগাটুকু বার করে রইল। তাঁরা তাদের কিছু বললেন না, জলার ধারে বিশ্রাম করতে লাগ্‌লেন।

জলাটার ওপারে দেড়তলা সমান উঁচু বহু ডাল-ওয়ালা মনসাগাছ দেখা যাচ্ছে। তারও ওধারে পেয়ারা গাছের মত বড় বড় গোটাকয়েক আকন্দ গাছ; তার ফল ফেটে তুলো উড়ছে। একটা কন্‌ডর—প্রকাণ্ড বাজপাখী, কালো মিশ্‌মিশে রঙ, গলায় সাদা চক্র—ছোট বাদামগাছের মাথায় বসে আছে। তার দৃষ্টি একটা ঝোপের দিকে। খুব সম্ভব সেখানে একটা খরগোস ছানা বা কাঠবেরালীর জাতভাই চিঞ্চিলা ছিল। চিঞ্চিলার লোম বেশ দামী পণ্য। এরা জলে চমৎকার সাঁতার কাটে। বাস করে কিন্তু জলাশয়ের বা নদীর ধারের গর্ত্তে। যা পায় তাই ইঁদুরের মত কেটে কুটে একাকার করে। এক

জাতের চিঞ্চিলা আবার বেজায় চোর। যা সামনে পায় নিয়ে পালায়, তা সে বুট্‌জুতোই হোক্ আর ছড়িই হোক্।

বণিক মশায়ের মন তখন বাড়ীর দিকে। তিনি একবার ভাবছেন, আমেজনের তীর ধরে যাবেন। কিন্তু নদীর ধারে ধারেই জংলীদের বাস। আবার ওদের হাতেই পড়তে হবে? তবে সব জায়গায় ওরা বাস করে না। আচ্ছা, আরও ক্রোশ চারপাঁচ এগিয়ে যাওয়া যাক্;

ডুম্—ডুম্—ডুম্। কিসের শব্দ? সকলে কানপেতে রইল। সর্ব্বনাশ! এ যে জংলীদের টেলিগ্রাফ। শব্দটা দূর হতে দূরে—আরও দূরে—বহুদূরে চলে চলে যাচ্ছে। এখন উপায়?

সকলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে বন, সামনে জল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বনের গাছপালা, দুচারটা পাখী ও সেই ক্যাপিবরা দুটো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। নিশ্চয়ই জংলীরা তখনও সেখান থেকে দূরে আছে।

"চল—চল—" বলে বণিক মশায় স্বয়ং অগ্রসর

হলেন। অমনি শোঁ করে তাঁর কানের কাছ দিয়ে একটা তীর চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুড়ুম্ শব্দ ও ধোঁয়া। তারপরই গাছ-পালার মধ্যে ধপ্ করে কি যেন পড়ল। এদিকে একজন মাল্লা বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে, আর, ওদিকে জলার ওপারে একটা জংলী মরে পড়ে আছে। কাজটা মাঝির। মাল্লাকে হত্যা করবার শোধ সে নিলে। মাল্লাটা অল্পক্ষণের মধ্যেই মরে গেল।

সকলের মুখ দুঃখে ম্লান। মাঝি আবার বণিক মশায়ের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর জন্যেই এত বিপত্তি। দেশে যে কেউ ফিরবে সে আশা বড় কম। হয় সাপ-খোপ বা জাগুয়ারে খাবে, না হয় জংলীদের হাতে প্রাণ যাবে। কোন রকমে যদি বা ওদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ছাড়বে না। রাক্ষসীটা মানুষ খেতেই ভালবাসে। এ বনের সর্ব্বত্র তার বাসা।

মাঝি বল্লে, "এই খস্তে সুরু হ'ল"

বণিক মশায় তাঁর মনের কথা বুঝতে পারলেও কোন উত্তর দিলেন না। আর সকলকে উদ্দেশ

করে বল্লেন, "এই জলার ধারেই একে কবর দেওয়া যাক্। এস সকলে গর্ত্ত খুঁড়ি।"

মাঝি রাগ কর্‌লেও সেও গর্ত্ত খুঁড়্‌তে লেগে গেল। ভিজে মাটি; অল্পক্ষণ চেষ্টা করেই একটা ছোট-খাট অগভীর গর্ত্ত খোঁড়া হল। মাল্লাটার বুক থেকে তীরটা খুলে নিয়ে সকলে তাকে কবর দিলে। তারপর গাছের একটা মোটা ডাল কেটে তাই দিয়ে একটা 'ক্রশ' তৈরী করে কবরের মাথার দিকে পুতে রেখে দুঃখিত মনে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল।

বেলা পড়ে আসে।

মাথার ওপরে গাছের ডালে কোথাও ময়ূর বসে আছে; কোথাও প্রকাণ্ড মৌচাক বা রঙিন বোল্‌তার বাসা। এক একখানা মৌচাক প্রায় হাত সাতেক লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া। এখানকার মৌচাকের মধু টক, মিষ্টি নয়। খুব সম্ভব মাছিরই গুণে এ রকম হয়। কাজেই মধু যে কেবল মিষ্টি হয় তা নয়, তা দিয়ে বিনা টকে চাট্‌নী রাঁধাও চলে দেখা যাচ্ছে। মধু খাবার লোভ হলেও বণিক মশায়রা চাকে ঢিল মারলেন না, প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগলেন।

এক, দুই, তিন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যা হয়ে এল। বন অন্ধকার। নিশাচর প্রাণীদের চোখ জ্বলে উঠেছে। কত রকমের পোকা-মাকড় কত রকমের সুরে ডাকতে সুরু করে দিলে তার অন্ত নেই। এবার কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাবে? গাছে? কিন্তু তাও ত নিরাপদ নয়। নানা রকমের পিঁপড়ের কথা তাঁদের শোনা ছিল,—লাল, কাল, হল্‌দে। তারা কুটুশ করে না, কটাশ করে কামড়ে গা কেটে রক্ত বার করে দেয়। আবার এক রকমের পিঁপড়ে আছে, লম্বায় এক ইঞ্চি কি তারও বেশী। তারা যেন কাঁক্‌ড়া-বিছে, কামড়ালে আর রক্ষা নেই! ভয়ানক বিষ।

গাছের ডালে সাপও থাকে। সেও একরত্তি নয়, যাকে বলে বোয়া, চোক দুটো তাদের পালিশ করা ইস্পাতের মত ঝক্ ঝক্ করে। আর জাগুয়ার ত গাছে চড়তে ওস্তাদ। রাতের বেলা যদি গাছে উঠে আসে? এত বিপদ সত্ত্বেও গাছের ডালই সকলের চেয়ে নিরাপদ স্থান। তাঁরা কয়েকটা বড় বড় গাছ দেখে, সেগুলোর ডালে চড়ে বস্‌লেন।

ততক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে, যেন মুঠো করে ধরা যায়। বণিক মশায় আর তাঁর চাকর উঠেছিল এক গাছে। আর এক্ক গাছে মাঝি ও তিনজন মাল্লা। সে গাছটা এ গাছ থেকে অনেকটা দূরে। তাদের চারাদকে পাতার নীচে, মাটির ওপর, শূন্যে, ডালে ডালে পিট্ পিট্ করে জোনাকী জ্বলে উঠ্ছে। ব্যাপার দেখে মনে হল কে যেন অন্ধকারে খাব্লা খাব্লা জোনাকী ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিছু দূরে একটা পিউমা ডেকে উঠ্ল। সকলে চুপ্-চাপ্ বসে আছেন।

কিছুক্ষণ যায়—রাত অনেকটা গড়িয়ে গেছে। সকলেই ক্লান্ত কিন্তু কারো চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ মনে হল যেন সোঁ সোঁ শব্দে বনের মধ্য দিয়ে জলধারা ছুটে আস্ছে। তাঁরা অবাক্। একি বন্যা এল ? আমেজন ফেঁপে উঠেছে ? হায় ! হায় ! এবার আর প্রাণের আশা নেই। শব্দটা ক্রমে কাছে এসে তাঁদের গাছের তলায় এসে সর্ সর্ কল্ কল্ করতে লাগ্ল। বণিক মশায় একবার সাহসে ভর করে টর্চ্ জ্বেলে

দেখ্‌লেন। একি? জল কোথায়? এ যে দেখ্‌ছি পেকারী! একটা প্রকাণ্ড দল এসেছে। পেকারী শূকরের মত জন্তু। পিঠ থেকে পেটের ওপর দিয়ে একটা ডোরা দাগ। জন্তুগুলোর মেজাজ বড় খারাপ। অমন যে বাঘের জাত জাগুয়ার—তাকেও কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেড়ে মেরে ফেলে। এদের ভয়ে বনবাসীরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত—ঐ বুঝি পেকারীর দল আসে! বণিক মশায়রা গাছের ডালে কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

পেকারীগুলো ঘণ্টাখানেক সেখানে থেকে সোঁ সোঁ শব্দে একদিকে চলে গেল।

আবার সব নিঝুম।

ওদিকে গাছের ডালে বসে মাঝি ফন্দী আঁটছে—বণিক মশায়দের ফেলে কি করে তারা পালাবে। ওঁর সঙ্গে থাক্‌লে আর কারো রক্ষা নেই। বহুক্ষণ ফিস্‌ ফিস্‌ করে তাদের পরামর্শ চল্‌ল। কিন্তু সকলে একমত হতে পারে না। বাস্তবিক বণিক মশায়ের কি দোষ? শেষে মাঝির কথায় সকলে সম্মত হল। সকলেই বললে, "ওদের দুজনকে ফেলে

পালানই যাক্। নিজেদের বুদ্ধিতে চলে আমরা বাঁচলেও বাঁচতে পারি। চাকরটাকেও যদি সঙ্গে নেওয়া যেত, বণিকটা খুবই জব্দ হত। কিন্তু তা হবে না ; বড় প্রভুভক্ত চাকর—"

যে কথা, সেই কাজ। সকাল হল। বণিক মশায়রা গাছ থেকে নামলেন। মাঝিদের ডাক্‌লেন। কিন্তু কারো সাড়া নেই। আবার ডাকলেন—তবুও নিরুত্তর। তাঁরা ভীত ও ব্যস্ত হয়ে তাদের গাছটার তলায় গিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখেন, গাছে কেউ নেই। নীচে চারদিকে খুঁজে দেখ্‌লেন, কারো কোন চিহ্ন নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগলেন, কি হ'ল ? ভাব্‌তে ভাব্‌তে সিদ্ধান্ত করলেন, তারা তাঁদের ফেলে পালিয়েছে। নাহলে এমন নিরুদ্দেশ হবার কারণ কি ? ভাল কথা। যাক্ ওরা। আমরাও চলি। দেখা যাক্ শেষ অবধি কারা দেশে ফেরে।

---

(৩)

সম্মুখে আকাশ-প্রমাণ উচু ঝাঁকড়া গাছ। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন পাহাড়। গোটা কয়েক মাকড়শা-বাঁদর তার আগ-ডালে লেজ জড়িয়ে চার হাত-পা ছড়িয়ে দোল খাচ্ছে। একটা বাঁদর ওপর থেকে হাত তিরিশেক নীচের ডালে ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু হাত বা পা দিয়ে ডালটা ধরলে না, লেজটা ডালের গায়ে জড়িয়ে দিলে! বাঁদরগুলো পাকা চোর। টোউকান পাখী গাছের গুঁড়ির গর্ত্তে সাদা রংয়ের ডিম পাড়ে। বাঁদরগুলো তার মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে ডিম চুরি করে খায়।

বণিক মশায়রা আরও কিছু দূর গিয়ে গোটা দুই টোউকান মারলেন। পাখীগুলোর মাংস বেশ। এরা খুব উঁচু ডালে বাস করে, ডিম পাড়ে গাছের কোটরে।

বণিক মশায়ের ইচ্ছা গোটা দুই মারমোসেট ধরেন। কিন্তু সেখানে মারমোসেট কোথায়? ওরা

থাকে জলা জায়গায়, ঘন বনে, গাছে গাছে, যেখানে মানুষের বসতি বা যাতায়াত নেই ; কখনও মাটিতে নামে না। মারমোসেটরা জাতে বাঁদর। কিন্তু চেহারা বড় সুন্দর ও নানা রকমের। ওদের গায়ের লোম কোমল ও চক্‌চকে। আকারে যেন কাঠবেরালী। আট দশটি এক সঙ্গে বেড়ায়। পুরুষই হলেন দলের কর্ত্তা। তিনি থাকেন সকলের আগে, আর মেয়েরা সারবেঁধে ছেলে-মেয়ে পিঠে পিছনে। এরা বড় ভীরু প্রাণী ; চলে আর থম্‌কে দাঁড়ায়। জীবন্ত ধরা যায় না, বহু কষ্টে ধরলেও কিছু দিনের মধ্যেই মরে যায়। জংলীরা ফুঁকো-তীর মেরে বহু চেষ্টায় দু-একটা শিকার করে।

দুপুরের দিকে চাকরটা বল্‌লে—"কর্ত্তা, শরীর ভাল ঠেক্‌ছে না।"

বণিক মশায় তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেন খুব গরম। জ্বর হয়েছে। এ ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

সে বল্লে—"আর চল্‌তে পারছি না, বড় তৃষ্ণা—"

কিন্তু এখানে কোথায় বা জল, আর, থাকাই বা

যায় কোথায় ? মাটিতে থাক্‌লে আর রক্ষা নেই। এই জ্বর নিয়ে গাছেই বা ওঠা যায় কেমন করে ?

দূর থেকে হাড়গিলের ডাক শোনা যাচ্ছিল। একটা গাছের ডালে কয়েকটা বক উড়ে এসে বস্‌ল। একবার 'কটর্‌' করে একটা শব্দ হল। বণিক মশায় বুঝলেন, কাছেই কোন জলাশয় আছে। কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছ থেকে ঝুরি নেমেছে যেন ঝালর। বণিক মশায় চাকরটাকে তার তলায় বসিয়ে সেই জলাশয়ে জল আন্‌তে গেলেন।

ঘন ঝোপ ঠেলে, গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেন সাম্‌নে প্রকাণ্ড এক অজগর মরার মত পড়ে আছে ! ঐ যে ওর গায়ের ওপর ছোট মাথাটা, পলকহীন কালো দুটো চোখ। উনিই মাঝে মাঝে করছেন 'কট্‌র্‌'। আশা, ডাক শুনে যদি কেউ কাছে আসে। বণিক মশায় তার মাথায় একটি গুলি লাগালেন। মাথা উড়ে গেল কিন্তু নাগরাজ অমনি কুণ্ডুলী পাকিয়ে, চীৎ হয়ে, কাৎ হয়ে বিশাল দেহটাকে এমন আকার দিলেন যে দেখ্‌লে হাসিও পায়, ভয়ও হয়। তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি

এগিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। সামনে একসার গাছ ও ঝোপ-ঝাড় পার হতেই দেখা গেল একটা ছোট নদী। তার ওপারে গভীর বন।

তখন শীতের শেস। নদার জল শুকিয়ে গেছে। তবুও মনে হল, বেশ গভীর। তীরে হাড়গিলেরা লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে চরে বেড়াচ্ছে। ছু-একটা ভাবুকের মত এক জায়গায় চুপ্‌ করে বসে আছে। নদীর মাঝখানে একটু চর। কয়েকটা কুমীর—মাছ-খেকো নয়, একেবারে মানুষ-খেকো—তার ওপরে চুপ্‌ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে। শিকার করবার জন্যে বণিক মশায়ের বড় হাত নিশ্‌পিশ্‌ করতে লাগ্‌ল। কুমারের চামড়ার দাম অনেক। কিন্তু ওদিকে চাকরটা তৃষ্ণায় মরে। তিনি নদী থেকে বোতলে জল ভরে নিলেন।

বণিক মশায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছেন। নদীটা আমেজনেরই শাখা। আচ্ছা, ভেলা বেঁধে গেলে কেমন হয়? এই ত বনে অনেক বড় বড় গাছ, ভেলা বাঁধবার কাঠের অভাব নেই। কিন্তু একি? তিনি চলেছেন কোথা? প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, তবুও

সেই গাছের তলায় পৌঁছতে পারলেন না ত? শেষে কি পথ ভুল হল? বিচিত্র নয়। না, না—ঐ যে সেই ঝুরি-ঝরা বুড়ো গাছটা। তিনি সেই দিকে তাড়াতাড়ি ছুটলেন। কাছে গিয়েই ভুল ভেঙে গেল। না—এ ত সে গাছ নয়! এ জায়গাটার চারদিকে কেবল ঝুরি-ঝরা বুড়ো গাছের আড্ডা। তিনি আবার সেখান থেকে চল্‌তে লাগলেন। কিছু দূর চলে আবার ভুল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকলেন—"পিণ্টো— ও—ও—"। পিণ্টো তাঁর চাকরের নাম।

পিণ্টোর সাড়া মিল্‌ল না। তিনি আবার ডাকলেন। কোন সাড়া নেই। তাঁর নিজের ওপর ধিক্কার এল। "কি আহাম্মক আমি! কম্পাসটা কেন সঙ্গে নিই নি। এ বন যে সমুদ্রের মত। এখন উপায়?"

তিনি ক্ষণিক সেখানে দাঁড়িয়ে, শেষে যে কোন একটা দিকে চল্‌তে লাগ্‌লেন। ঐ যে আবার হাড়গিলের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাঃ! সেই নদী! কাদার ওপর দেখ্‌ছি জুতোর দাগ। আমারই

জুতো। অবার—দাঁড়াও—একটু ভেবে নিই। "ঠিক হয়েছে—ঐ বাদাম গাছের তলা দিয়ে, সাঁড়াশী লতাগুলো ডাইনে রেখে গেলে—" বলেই বণিক মশায় তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌লেন।

চল্‌তে চল্‌তে তিনি নিজের মনেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"ওরে বাবা! কত বড় মাকড়শা!" আধ-ফুট লম্বা। এর কামড় খেলে লোকের আর রক্ষে থাকে না। উঃ, কি জ্বালা ওর বিষের! "ও আবার কে? পেকারী না তাপীর? হাঃ—হাঃ—পিঁপড়ে-খেকো সরু ঠোঁট দিয়ে কেমন পিঁপড়ে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ওকে আবার ভয় কি? ঐ যে ঝুরি-ঝরা বুড়োটা! পিণ্টো—ও—ও—"

উত্তর পেলেন, "হুঁ—উ—উ—উ—"

বণিক মশায় ছুট্‌তে ছুটতে গিয়ে দেখেন, সে সটান শুয়ে পড়েছে। তার চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। বণিক মশায় তাকে জল দিলেন। সে জল খেয়ে যেন কিছু সুস্থ হ'ল। কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—"কর্ত্তা, কি হবে?"

বণিক মশায়ও তাই ভাবছিলেন। তিনি তাকে

ঘরের সামনে আগুন জ্বেলে টৌউকান দুটো ছাড়িয়ে সেই আগুনে ঝল্‌সে নিচ্ছেন।

অভয় দিয়ে গাছের ডাল সংগ্রহ করতে গেলেন। ঘর তৈরী করবেন। কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমে কোন রকমে তুটি লোকের থাকবার মত একখানি পাতার কুঁড়ে তৈরী হল। চারদিকে ডাল ও পাতার বেড়া; ওপরে ডাল-পাতার ছাউনী। ঘরে যাতায়াতের ছোট একটি দরজা। বণিক মশায় পাতা বিছিয়ে পিণ্টোর বিছানা করে দিলেন। তাকে তার ওপর শুইয়ে ঘরের সামনে আগুন জ্বেলে টোউকান তুটো ছাড়িয়ে সেই আগুনে ঝল্‌সে খেতে সুরু করলেন। পেটে যেন সাতটা উন্নুন জ্বল্‌ছে। ক্ষিদের সময় সেই মাংসই অমৃত সমান।

চারদিকে বন। নীচে রাশি রাশি শুক্‌নো পাতা; তার তলায়, ওপরে গুবরে পোকা। টোউকান পাখীর নাড়ী-ভূঁড়ি নিয়ে তাদের ভোজ লেগে গেল। বড় বড় লাল পিঁপড়েদের চরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা বাসায় গিয়ে খবর দিলে। অমনি সৈন্যের মত সারি বেঁধে শুঁয়ো নাড়্‌তে নাড়্‌তে সকলে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল। এসেই জিনিষটার দখল নিয়ে গুবরে পোকাদের সঙ্গে তাদের ভয়ানক যুদ্ধ লেগে গেল। প্রায় আধ-

ঘণ্টা মারামারি চল্‌ল। অনেকগুলি পিঁপ্‌ড়ে মারা গেল, গোটা কয়েক গুবরে পোকা চীৎ হয়ে, হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রইল। শেষে দুই দলে সন্ধি হয়ে যে যা পারে তাই নিয়ে খেতে সুরু করে দিলে।

বণিক মশায় বসে বসে এই সব দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এদিকে **সন্ধ্যা** হয়ে এল। পিণ্টো বেচারা তখন জ্বরের ঝোঁকে বেহুঁস পড়ে আছে। গা তার এত গরম যে মনে হচ্ছে তাপ ১০৫ ডিগ্রি। সন্ধ্যার সঙ্গেই মশার ঝাঁক এল যেন কালো ধোঁয়া। দূরে কোথায় যেন সিকালা পোকা শিষ দিচ্ছে। হঠাৎ শুন্‌লে মনে হয়, রেলের এঞ্জিন।

অনেক রাতে আবার এল এক জোড়া নেক্‌ড়ে। সারাদিন বোধহয় তাদের কপালে কিছু জোটে নি। তাই রাতভোর বণিক মশায়দের কুটীরের চারপাশে ঘোরা-ঘুরি করলে। কিন্তু অমন লম্বা-চওড়া মানুষ দুটোর কাছে যেতে সাহস হল না। ভোর হতেই পালিয়ে গেল।

সকালে পিণ্টো কিছু সুস্থ বোধ করতে লাগ্‌ল। বল্লে—"কর্ত্তা, চলুন। যেতে পারব—"

বণিক মশায় তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেন তখনও জ্বর আছে।

তিনি কাল থেকে ফন্দী আঁটছেন, সেই নদী দিয়ে ভেলায় চড়ে যাবেন। না গেলেও নদী পার হবার জন্যে একটা ভেলা চাই-ই। তিনি পিণ্টোকে শুইয়ে রেখে আবার নদীর ধারে গেলেন। দেখ্‌লেন কূলে হাতের মুঠোর মত বড় বড় শামুক বেড়াচ্ছে। জলে প্রকাণ্ড একটা কাছিম ভেসে উঠ্‌ল। সেটা ওজনে মণ দুই হবে। কাছিমটা হাঁচড়-মাচড় কর্‌তে কর্‌তে আস্তে আস্তে জল থেকে কূলে উঠ্‌ল। একবার বণিক মশায়ের দিকে মাথা তুলে তাকালে, অবার ঝপ্‌ করে জলে নেমে গেল।

বণিক মশায় চারধারে তাকিয়ে দেখ্‌লেন দূরে একটা প্রকাণ্ড শুক্‌নো গাছ পড়ে। ওর পাশে ওটা কি? ঐ যে নড়ছে! মানুষ? হাঁ, মানুষই ত। লোকটা যেন তাঁকে দেখে লুকোচ্ছে। জংলী কি? তিনি ঝোপের আড়ালে আড়ালে তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগোতে লাগ্‌লেন। কিছুদূর গেলে লোকটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। চেহারা জংলীদের মত;

কিন্তু পরণে একটা ছেঁড়া পাজামা, হাতে একখানা কুড়ল। তার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে গাছের গায়ে একটা বন্দুক হেলান দেওয়া রয়েছে। বণিক মশায় আর না এগিয়ে ভাব্‌তে লাগলেন—কি করা যায়। ওর পোষাক দেখে মনে হচ্ছে, সভ্য মানুষদের সঙ্গে মিশেছে। হয়ত ওর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। তিনি সেখান থেকে হাঁক দিলেন। লোকটা চম্‌কে ফিরে তাকাল এবং তাড়াতাড়ি গাছের গা থেকে বন্দুকটা তুলে নিল। বণিক মশায়ের দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁকে নমস্কার কর্‌ল।

তারপর দুজনের পরিচয় হ'ল। সে বল্‌লে, বাড়ী তার সেখান থেকে একদিনের পথ। সেখানে এসেছে কুমীর ধর্‌তে। তার সঙ্গে আরও তিনজন আছে। তারা গেছে বনের মধ্যে শিকারে। শিকারের নাড়ী-ভুঁড়ি দিয়ে বঁড়্‌শীতে টোপ গাঁথা হবে।

বণিক মশায়ও তাকে তাঁদের দুর্দ্দশার কথা জানিয়ে বল্লেন—"আমাদের যদি নদীটা পার করে দাও—"

"কোথা যাবেন ? ওদিকে একেবারে পথ নেই। যেতে হলে আমাদের গাঁ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। সেখান থেকে শহর একমাসের পথ। আমি শহর চিনি। সেখানকার ইস্কুলে পড়েছি। কিছুদিন এক সাহেবের বাড়ীতে চাকর ছিলুম। এখন কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতেই থাকি। আচ্ছা বেশ, আমি আপনাদের পৌঁছে দেব। আজকে কুমীর ধর্‌ব। কুমীরের মাংস খেয়েছেন ? খুব মিষ্টি।" বলে হি—হি—করে হেসে উঠ্‌ল।

বণিক মশায় একটু ভেবে তার কথাতেই রাজী হলেন। কিন্তু সেখানে আর অপেক্ষা করলেন না। পিণ্টো বেচারার খবরটা সব আগে নেওয়া দরকার।

তিনি কয়েক পা গিয়েই যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠ্‌লেন। জংলীটা তাঁর কাছে ছুটে এল।

বণিক মহাশয় যন্ত্রণায় লাফাচ্ছেন আর বার বার জামা ঝাড়ছেন। শেষে জামাটা খুলে ফেল্‌লেন। দেখা গেল, প্রকাণ্ড একটা পিঁপড়ে জামার ভেতর পিঠের দিকে শুড়্‌ শুড়্‌ করে চলে যাচ্ছে। তার

বিষের কি ভয়ানক জ্বালা! জায়গাটা ওলের গেঁজের মত ফুলে উঠেছে।

জংলীটা তখনই পিঁপড়েটাকে মেরে তাঁর পিঠে ঘষে দিয়ে দৌড়ে বনের মধ্যে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরে এল, হাতে ছোট একটি পাতা। সে পাতাটা হাতের চাপে তালগোল পাকিয়ে রস বার করে বণিক মশায়ের পিঠে ব্যথার ওপর লাগিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। মিনিট খানেকের মধ্যেই সব জল। কিন্তু ফুলোটা কমল না।

দুপুর বেলা। মনিব-চাকর দু'জনে সেই নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন। দেখেন প্রকাণ্ড এক কুমীর। জংলী চারটেতে মিলে তাকে টানাটানি করছে। সেও উঠ্বে না, এরাও ছাড়বে না।

কুমীরটা এক মস্ত বঁড়্শী গিলেছে। বহু চেষ্টা করেও বঁড়্শীটা খুল্তে পারছে না। খুল্বেই বা কি করে? বঁড়্শীটা আটকেছে একেবারে তার নাড়ি-ভুঁড়িতে।

বণিক মশায় বল্লেন—"এত কষ্টের দরকার

দেখেন প্রকাণ্ড এক কুমীর। জংলী চারটেতে মিলে তাকে টানাটানি করছে। সেও উঠবে না, এরাও ছাড়বে না।

কি ?" বলেই এক গুলী, একেবারে কুমীরটার চোখে।

জংলীদের কি স্ফূর্ত্তি। তার ছাল নিলে, মাংস নিলে, দাঁতগুলোও বাদ দিলে না।

তারপর গাছের কয়েকটা ডাল কেটে একটা মাচা তৈরী হল। সেই মাচায় উঠ্‌ল পিণ্টো, আর তার পাশে থাকল কুমীরের ছাল, নাড়ি-ভুঁড়ি, মাংস ও দাঁতগুলো। জংলী চারজন মাচাটা কাঁধে তুলে নিলে।

---

(৪)

তারা চলেছে। বণিক মশায় সকলের পিছনে। তাঁর হাতে কম্পাস, চলেন আর দেখেন। কিন্তু জংলীদের ওসব কিছুই দরকার হয় না। বনটা যেন তাদের কাছে পরিষ্কার রাস্তা। এক এক জায়গার এক একটা নামও আছে। কি করে যে নিশানা করে তারাই জানে।

দুপুরের দিকে একজায়গায় গিয়ে জংলীরা মাচা নামালে। জায়গাটার চারদিকে ফুল ফুটে আছে। যে দিকে তাকাও শাদা ফুল আর রঙ্গিণ প্রজাপতি, একটা নয়, দশটা নয়, একশটাও নয়, বোধহয় হাজারে হাজারে প্রজাপতি উড়ছে, বস্‌ছে, আস্‌ছে, যাচ্ছে। এক এক জায়গায় মেঘের মত জমাট বেঁধে উঠ্‌ছে, আবার রকেট বাজীর মত ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। তারা মানুষ পাঁচজনের মাথায়, কাঁধে, কাণে, নাকে, মুখে, গায়ে, পায়ে পিট পিট করে বস্‌তে

জংলীরা মাচা কাঁধে তুলে নিলে

লাগ্‌ল। সম্মুখে প্রজাপতি ছাড়া কিছু দেখা যায় না, পিছনেও প্রজাপতি, আশে, পাশে মাথার ওপর—সর্ব্বত্রেই প্রজাপতি। তাদের পাখার পত্‌পত্‌ শব্দ হচ্ছে। বণিক মশায়ের মনে হতে লাগ্‌ল, তিনি কোন্‌ পরীর দেশে এসে পড়েছেন। এখনি হয়ত পরীরাণী এসে একটা অদ্ভুত কোন কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে। তখন আর দেশে ফেরা হবে না। প্রজাপতি-দের পায়ের শুড়্‌শুড়ি্‌তে সকলে অস্থির। গাও কেমন ছম্‌ ছম্‌ করছে। পালা—পালা—।

জংলীরা মাচা কাঁধে তুলে নিলে। কিন্তু যাবে কোথায়? এ অঞ্চলটার চারদিকে প্রজাপতি। প্রায় দু মাইল তাদের রাজত্ব। সকলে ছুটে চল্‌ল। নাকে, মুখে, চোখে প্রজাপতি লাগ্‌ছে যেন পেঁজা তুলো। পিণ্টো বেচারার আরও বিপদ। তার গায়ে এত প্রজাপতি বসেছে যে দেখ্‌লে মনে হয় সে ফুলে সাজান মড়া। সে গাও ঝাড়া দিতে পারে না, নড়তেও পারে না। এক একবার যেই হাত-পা ছোঁড়ে, অমনি মাচাটা দুলে ওঠে, জংলীদের কাঁধে বেজায় লাগে,—সঙ্গে সঙ্গে তারা চেঁচিয়ে ওঠে। যাই হোক, বহু কষ্ট সহ্য করে, হাঁপাতে হাঁপাতে

তারা প্রজাপতিদের এলাকা ছাড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড জলার ধারে এসে পৌঁছল।

বণিক মশায় বল্‌লেন, "এইখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।"

জলার ধারে গাছের ডালে কয়েকটা শ্লথ বেড়াচ্ছে। শ্লথগুলো ভারি মজার জানোয়ার। এদের হাত পায়ের নখ এমন বাঁকানো যে মাটিতে চলে ফিরে বেড়াতে পারে না। গাছেই ঝুলে থাকে, ঝুলে ঝুলে চলে, ঝুলেই জীবন কাটায়, আর, ফুল-ফল পাতা খেয়ে গাছকে গাছ সাবাড় করে।

হঠাৎ সকলের নাকে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ লাগ্‌ল। মনে হচ্ছে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি উঠে যাবে। বণিক মশায় ও পিণ্টোর খাওয়া হয়নি। ইচ্ছে ছিল, দু-চারটে পাখী শিকার করে ঝল্‌সে নেবেন। ম্যালেরিয়া রোগী পিণ্টোর উপযুক্ত পথ্য বটে, কিন্তু সেখানে তাকে দুধ-সাবু দেবে কে? বণিক মশায় ও পিণ্টো নাকে রুমাল চেপে ধরলেন! তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব চলে গেল। উঁঃ, কি বিশ্রী গন্ধ!

তার গায়ে এত প্রজাপতি বসেছে যে দেখ্‌লে মনে হয় সে ফুলে সাজান মড়া।

বণিক মশায় চারদিকে তাকাতে লাগ্‌লেন। কোথা থেকে গন্ধ আস্‌ছে ?

জংলীরা চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ঐ যে—"

বণিক মশায় দেখ্‌লেন বিড়ালের মত ছোট একটি প্রাণী। ঝাঁকড়া লোমওয়ালা তার লেজ, গায়েও বড় বড় কালো লোম, মাথা থেকে পিঠের দুপাশে সাদা টান। এর নাম স্কান্‌ক্‌। ঐটুকু প্রাণী কিন্তু ভয়ে ওদের কাছে জাগুয়ার বা পিউমাও যেতে পারে না। ওরা শত্রুর মুখে-চোখে এমন দুর্গন্ধযুক্ত রস ছিটিয়ে দেয় যে তার ঠেলায় পালাবার পথ থাকে না। ওদের এই বিশ্রী অস্ত্রের শক্তির বিষয় ওরা বেশ সচেতন। সেই জন্যে তাড়া করলে সচরাচর পালায় না। শত্রু যেই কাছে যায়, অমনি ওরা ঐ দুর্গন্ধ তপ্ত রস তার মুখে-চোখে ছেড়ে দেয়।

বণিক মশায় বল্লেন, "ওঠ—ওঠ—বেশীক্ষণ থাক্‌লে গন্ধে নাড়ী-ভুঁড়ি পর্য্যন্ত উঠে যাবে।"

পিণ্টো বল্‌লে, "এবার আর কাঁধে নয়। হেঁটেই যাব—"

জংলীরা কেবল কুমীরের নাড়ী-ভুঁড়ি সুদ্ধ মাচাটা

কাঁধে তুল্‌লে। পিণ্টো সকলের সঙ্গে হেঁটেই চল্‌ল। সেই জলার ধার দিয়ে ঘুরে বনের মধ্যে দিয়ে চলে তারা নদীর ধারে এসে পড়ল। . তার ধারে ধারেই পথ। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, তবুও কোথায় গাঁ ? ক্ষুধায় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হবার মত। বোতলে যে জল ছিল, অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।

বণিক মশায় নদী থেকে বোতলে আবার জল ভর্‌তে জলে নামতে গিয়েই একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালেন। ঝোপটা জলের ওপর নুয়ে আছে। কিন্তু তার মধ্য থেকে গলা বাড়িয়ে ওকে? জাগুয়ার! জাগুয়ারটা বোধ হয় মাছ ধর্‌ছে। মাছ ছাড়া এ অঞ্চলে খাবার মত বড় জানোয়ার আর কি আছে? জাগুয়াররা গাছেও চড়ে, মাটিতেও থাকে। গাছে উঠে বাঁদর ও পাখী ধরে খায়। আর মাটিতে নদী, নালা বা জলাশয়ের ধারে থাক্‌লে মাছও ধরে, বালির ভেতর থেকে কাছিমের ডিমও খুঁড়ে খায়। জানোয়ার-গুলোর গায়ে যেমন জোর, বুকে সাহসও তেমনি—ভয়-ডর কিছু নেই। কিন্তু স্কান্‌কের কাছ থেকে সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকে। যে বিশ্রী গন্ধ!

কিন্তু তার মধ্যে গলা বাড়িয়ে ও কে ? জাগুয়ার !
জাগুয়ারটা বোধহয় মাছ ধরছে ।

বণিক মশায় খুব সন্তর্পণে বন্দুকটা তুলে জাগুয়ারটার প্রকাণ্ড মাথাটা লক্ষ্য করলেন। হঠাৎ জাগুয়ারটা ফিরে দাঁড়াল। কি ভয়ঙ্কর চোখ দুটো! ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বল্‌ছে। বণিক মশায়কে দেখেই সে মাথাটা ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তারপরই পিছনে আবার ঐ কিসের শব্দ? তিনি চট্ করে ফিরে তাকিয়ে দেখেন একটা কুমীর; তাঁর পায়ের কাছ থেকে মাত্র হাতখানেক দূরে—পা কামড়ে ধরে আর কি। বণিক মশায় এক লাফ দিয়ে সরে যেতে না যেতেই তাঁর মাথার ওপর গাছের ডাল থেকে কি যেন একটা সেখানে ধপ্ করে লাফিয়ে পড়ল। একেবারে তাঁর ঘাড়ে—না—না—কুমীরটার সমুখে। অমনি সোঁ করে দুটো ফুঁকো-তীর এসে বিঁধ্‌ল একটা কুমীরে চোখে আর একটা জাগুয়ারটার বুকে। বণিক মশায়ের মনে হল, তিনি যেন বায়স্কোপ দেখ্‌ছেন। একবার মৃত জন্তু দুটোর দিকে, একবার পাড়ের ওপর তাকিয়ে দেখ্‌লেন। দেখেন তাঁর সঙ্গী দু'জন জংলী দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাস্‌ছে। তারাও জল খেতে

এসেছিল। কিন্তু জলে নামবার পথে এই মজার কাণ্ড।

কিন্তু এ জাগুয়ারটা আকারে একটু ছোট বোধ হচ্ছে ; সে জাগুয়ারটা ত নয়। সেটা কোথায় গেল ?

জংলীরা বল্লে—একটা জাগুয়ারকে তারা ঐ দিকে যেতে দেখেছে।

"তা হলে ত বিপদ—"

তিনি পেটপুরে জল খেয়ে বোতলে জল ভরে নিলেন এবং তাড়াতাড়ি হেঁটে রাত যখন দশটা তখন জংলীদের গ্রামে এসে পৌঁছলেন।

---

(৫)

ছোট গ্রাম। দু চারখানি ঘর। কিন্তু তা মানুষ বাসের অযোগ্য—গোয়াল বললেই চলে। গ্রামের বাসীন্দাও বেশী নয়। সকলেই উলঙ্গ; তাদের হাতে, পায়ে, গায়ে, মুখে, নাকে বীভৎস উল্কা। গ্রামখানার চারদিকে গভীর বন। বেশীর ভাগ গাছ-গাছড়াই অচেনা। তবে তার মধ্যে লেবু, কলা, গোটা দুই আম ও কয়েকটা কাঁটাল ও রবার ছিল। ব্রেজিল থেকে জাহাজ বোঝাই করে নানা দেশে কলা চালান দেওয়া হয়। সে দেশের কলা এখানকার বাজারেও আসে। বণিক মশায় সেদিন সেখানে বিশ্রাম করতে লাগ্‌লেন। পিণ্টো সুস্থ আছে। কিন্তু খাবার দেখে ঘৃণায় তাদের বমি এল। সাপ, শিয়াল আবার কে খায়? তাঁরা দু'জনে দু'ছড়া কলা খেয়ে দিন কাটালেন।

সন্ধ্যে হতেই জংলীদের ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বলে উঠ্‌ল। সে লণ্ঠন দেখে বণিক মশায়রা অবাক্।

কাঠের খাঁচা ; তার মধ্যে গোটা দুই করে পোকা। সে আমাদের জোনাকী নয়, তাদের আলো মাথায় জ্বলে যেন মণি। অন্ধকার রাতে বনের পথে ঐ পোকা ধরে জংলীরা লণ্ঠনের কাজ চালায়। মেয়েরা চুলে পরে, গায়ে সারি সারি বসায়। আর কোন উৎসবের রাতে যখন আট দশটি মেয়ে ঐ পোকার সাজ পরে অন্ধকারে সাপের মত শরীর বেঁকিয়ে এক সঙ্গে নাচে, তখন দেখ্‌তে লাগে চমৎকার।

যাহোক, পরদিন বণিক মশায় ও পিণ্টো সেই জংলীটাকে সঙ্গে নিয়ে শহরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথ অবশ্য বনের মধ্যে দিয়ে ; মাঝে মাঝে জলা ও কিছু ফাঁকা জায়গা পড়ে, তারপরই আবার ঘন বন।

দুপুরের দিকে শ্রান্ত হয়ে তাঁরা একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ মাথার ওপর একটা পাখী ডেকে উঠ্‌ল। সে স্বরে ভয় ও বেদনা মাখানো। তিনজনে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখেন, হাত কয়েক ওপরে গোটা দুই ডালের মাঝখানে একটি

দেখেন তাঁর সঙ্গী দু'জন জংলী দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাস্‌ছে

পাখার বাসা। তার বাইরে এধারের মোটা ডালে একটা ছোট পাখী চীৎ হয়ে আছে। আর প্রকাণ্ড একটা মাকড়শা লোহার সরু লম্বা হুকের মত হাত পা ও কাঁকড়ার দাড়ার মত ধারালো মুখ দিয়ে পাখীটার গলা চেপে ধরেছে। তাদের ওপর, বোধহয় পাখীটার স্বামী, ঘুরে ঘুরে চীৎকার করছে; ভয়ে মাকড়শাটার কাছেও যেতে পারছে না। বেচারী মা! একা বসে ডিম দুটিতে তা দিচ্ছিল। খুদে রাক্ষসটা চোরের মত চুপি চুপি পিছন থেকে এসে ওর টুঁটি কামড়ে ধরলে!

বণিক মশায়ের ইচ্ছা হল, রাক্ষসটাকে মেরে ফেলেন। কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? পাখীটা ত মরে গেছে।

খুদে রাক্ষসগুলো তাজা, গরম রক্ত খেতে খুব ভালবাসে। ওদের চেহারা যেমন কদাকার—হাত-পা-গুলো আধফুটের বেশী লম্বা—স্বভাবও তেমনি অভদ্র। ওদের জ্বালায় মাছি ও পোকামাকড়ের কথা ছেড়েই দিই, বনের ছোট পাখীরা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত! এরা আবার জাল পেতে রাখে। তার তন্তুগুলো

বেশ শক্ত ও আঠাল। সেই জালে পোকামাকড়, ছোট ছোট পাখীও পড়ে।

জংলীটা বল্‌লে, তারা মাকড়শাকে বিষাক্ত ফণাধর সাপও শিকার করতে দেখেছে। একবার এক জোড়া বড় মাকড়শা তাদের গ্রামের পাশের জঙ্গলে একটা সাপ শিকার করেছিল! মাকড়শা দুটো সাপটার ফণায় এমন ভাবে তাদের শক্ত আঠাল জাল জড়িয়ে দিয়েছিল যে, সাপটা দম আটকে মরে যায়। কিন্তু কি করে যে প্রথমে সাপটাকে জালে জড়িয়ে ছিল, তা কেউ দেখে নি। তবে সাপটা যে জাল-বাঁধা ফণা তুলে বৃথা ফোঁস ফোঁস করছিল, তা তারা দেখেছে।

পিণ্টো চীৎকার করে উঠ্‌ল, "ঐ যে সামনে একটা প্রকাণ্ড ঈগল, ছোঁ দিলে। দেখুন, দেখুন, একটা বাঁদরকে শূন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বাঁদরটার লেজ ঝুলছে যেন চিলে ঘুড়ি। কি সাংঘাতিক!"

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ঈগলটা উড়তে উড়তে বার কয়েক ঘাড় নীচু করলে। বোধহয় বাঁকা ঠোঁট দিয়ে বাঁদরটার টুঁটি চিরে

একটা মাকড়শা লোহার সরু লম্বা হুকের মত হাত পা ও কাঁকড়ার দাড়ার মত ধারালো মুখ দিয়ে পাখীটার গলা চেপে ধরেছে।

ফেল্ছে। এখনি ওর রক্ত খাবে। শেষ অবধি কি হল দেখা গেল না, ঈগলটা বাঁদরটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাঁরা আবার চল্‌তে লাগ্‌লেন। চল্‌তে চল্‌তে, চল্‌তে চল্‌তে সন্ধ্যায় এক জায়গায় এসে উপস্থিত। জায়গাটা বাদুড়ের রাজত্ব। তারা ফল-খেকো নয়, রক্ত-চোষা বাদুড়। চারদিকে বড় বড় গাছ। গাছগুলোর এক একটার বয়স পঞ্চাশ কি একশ বছর হবে। এক একটার গুঁড়ি আবার খুব মোটা, তার গায়ে গর্ত হয়ে গেছে; বাদুড়গুলো সেই গর্ত্তে বাস করে। সন্ধ্যে হলে কোটর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে উড়ে বেড়ায়।

জংলীটা বল্‌লে, "সাবধান—যখন কেউ ঘুমোয়, ওরা তখনই তাকে আক্রমণ করে। ওদের পাখা দু'খানা দিয়ে আস্তে হাওয়া দেয় আর মুখ দিয়ে শুড়্ শুড়্ করে শরীরের রক্ত চোষে। তার একটুও লাগে না; সে বেশ আরামে অঘোরে ঘুমোয়।"

বণিক মশায়ের মনে পড়ল, এ বাদুড়ের গল্প তিনি শুনেছেন বটে। এরা মানুষের রক্ত খুব

ভালবাসে। কেউ যদি খালি পায়ে ঘুমোয়, তাহলে তার আর কোথাও না কামড়ে, পায়ের আঙুলগুলো ফুটো করে রক্ত শুষে খায়।

বণিক মশায় বল্লেন, "খুব হুঁসিয়ার। আগুন জ্বালো—"

চাকরটা বল্‌লে "তা হলে পোকার ঠেলায় প্রাণ যাবে।"

"বাদুড়ের হাত থেকে ত রক্ষা পাব?"

"তা বটে—"

ডালপালা জড় করে তারা আগুন জ্বালিয়ে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারধার থেকে নানা রকমের পোকা নানা রকম শব্দ করে উড়ে এল। তাদের খোঁচা-খুঁচিতে পথিক তিনটির মুখ ও হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত। সারা রাতের মধ্যে কারো চোখে ঘুম এল না।

ভোর বেলার দিকে একটু তন্দ্রা এল বটে কিন্তু হঠাৎ একটা হৈ-চৈ ও চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। তিনজনে চোখ মেলে দেখেন, সামনে যমদূতের মত আট-দশটা লোক। তাদের হাতে তীর, ধনুক ও

বর্শা। তারা এক দৃষ্টে পথিক তিনজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বণিক মশায় ও পিণ্টোর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সেই জংলীটা উঠে দাঁড়াল। তারপর নাকি স্বরে তাদের কি যেন বল্‌লে। তারা মাথা নেড়ে বর্শা দিয়ে ডান দিকে দেখিয়ে দিলে। তাদের সঙ্গে জংলীটার আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল।

জংলীটা বণিক মশায়কে বল্‌লে, "কাল সন্ধ্যায় চারজন শহুরে লোক রাক্ষসদের হাতে ধরা পড়েছে। বোধ হয় এতক্ষণ তাদের একজনও বেঁচে নেই। লোক চারটে পথ-ভুলে জংলীদের এলাকার মধ্যে গিয়ে পড়ে—"

বণিক মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি করে জান্‌লে?"

"এরা বলছে। এদের সঙ্গে রাক্ষসগুলোর খুব ঝগড়া। তাই এরা খবর দেবে বলে শাদা মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বৎসর কয়েক আগে রাক্ষসদের সন্ধানে একদল সাদা মানুষ এসেছিল। তারা রাক্ষসদের দেখা পায় নি, কিন্তু তাদের ঘর-বাড়ী

জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তা আপনি সাদা মানুষ। এরা আপনাকে জানাচ্ছে—"

বণিক মশায় কথাটা শুনে মনে মনে হাস্‌লেন। তাঁকে এখন রক্ষা করে কে, তার ঠিক নেই। তবুও মুখে বল্লেন, "আচ্ছা, শহরে গিয়ে আমি একদল সৈন্য নিয়ে আসব। এত বড় অপরাধের শাস্তি দিতেই হবে—" বলে তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—লোক চারটে কারা ? মাঝি-মাল্লারা কি ? তারা ছাড়া আর কারা এ গহন বনে আস্‌বে ?

তিনি সেই লোকগুলোকে জংলীর মারফৎ কয়েকটা প্রশ্ন করে নিশ্চিত ভাবে বুঝ্‌তে পারলেন—হতভাগ্য লোক চারজন তাঁরই মাঝি-মাল্লা। বেচারারা বড় আশায় তাঁদের দুজনকে সেই গহন বনে ফেলে চলে গেছিল। কিন্তু দেশে ফিরতে পারল না। তাঁদের ভাগ্যেও শেষ অবধি কি আছে কে জানে ?

তবুও চলা যাক।

---

(৬)

"ঐ শুনুন কর্ত্তা ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। এরোপ্লেন—"

বণিক মশায় ও জংলীটাও সে শব্দ শুনতে পেয়েছেন। তিন জনে দৌড়ে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালেন। সত্যিই ত, সাতখানা বাইপ্লেন—তীরের আকারে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। পরিষ্কার আকাশ। প্লেনগুলো অনেক ওপর দিয়ে যাচ্ছে। কোন রকমে কি তাঁদের অবস্থাটা ওদের জানানো যায় না? না, কোন মতেই না। তাঁরা নিরুপায়। তিনজনে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। প্লেনগুলাও উড়তে উড়তে ক্রমে কালো দাগের মত হয়ে দূর আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

বণিক মশায়রা মনের দুঃখ মনে চেপে আবার চল্‌তে লাগলেন। অনেক দূর গিয়ে দেখ্‌লেন, কয়েকটা কাঠবেরালী এগাছ থেকে ওগাছে উড়ে যাওয়া আসা করছে। বাঃ! এত বড় মজার দেশ।

কাঠবেরালী লেজ তুলে ডালে ডালে ছুটেই বেড়ায় জানা ছিল। এদেশে পাখ্না মেলে উড়েও বেড়ায় ? আর পাখ্নারই বা কি শ্রী! চারখানাপা খানিকটা মাংসের পাতে আটকানো। সেই পাতখানা পাখ্নার কাজ করে।

এই দিন বিকেলের দিকে তাঁরা এক জংলীদের আস্তানায় এলেন। এখানে নতুন কয়েক রকম খাবার তাঁদের ভাগ্যে জুটল। বণিক মশায় বহুকাল চা বা কফি খান নি। জংলীরা তাঁদের চায়ের মত এক রকম পানীয় খেতে দিলে। জিনিযটা একটা ফলের শুকনো বিচির গুঁড়ো। জংলীরা সেই গুঁড়োকে ময়দার মত তাল পাকিয়ে রেখে দেয় এবং দরকার মত জলে গুলে খেয়ে থাকে। আবার এক রকম পামগাছের লম্বা পাতাও তাঁরা খেলেন। অবশ্য শাকের বদলে। পাম হলেও তা খেতে খারাপ লাগে না। এই পামগাছের ফল জংলীরা ভিজিয়ে রেখে খায়। কয়েকটা বাঁদুরে-বাদামও তাঁদের ভাগ্যে জুটল। এই বাদামগুলো থাকে কতকটা ঢাকনীওয়ালা গেলাসের মত পাত্রের

মধ্যে। বাঁদরে এই ঢাকনীটা পুট করে খুলে বাদাম বার করে খায়। এ বাদামেরও তেল হয়। এ তেল চিত্রকরদের ছবির কাজে লাগে।

এই আস্তানাটার একদিকে আনারসের বন। আর একদিকে কোকো ও কমলালেবুর কতকগুলো গাছ ছিল।

এইখানকার জংলীদের জল ইত্যাদি খাবার পাত্রগুলিও বেশ। কোনটা কাছিমের খোলার, কোনটা কুমড়োর খোলার; আবার দু'চারটে মাটির বাসনও দেখা গেল। বাসনগুলোর গায়ে রং দেওয়া ও চমৎকার কাজ করা। কিন্তু লোকগুলোর স্বভাব অতি নোংরা; তারা কোন পোষাকেরও ধার ধারে না।

জায়গাটা আগুটি ও পাকার রাজত্ব। বনে, জঙ্গলে, মাঠে ক্ষুদে শূয়রের মত আগুটিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছের ফুল, ফল, পাতা ও শিকড় খেয়ে বনকে বন সাবড়ে করছে। এরা ভারি চট্‌পটে; কিছুতেই ধরা যায় না, এক লাফে ঝোপের মধ্যে বা পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়। পাকাগুলোর গায়ে আবার চিতা-হরিণের মত সাদা ছাপ।

রাতের বেলা বণিক মশায়রা এক জায়গায় শুয়ে আছেন। কিছুতেই তাঁর চোখে ঘুম আর আসে না। তাঁদের চারধারে জঙ্গল। কাছেই একরাশ শুক্‌নো ডালপালা পড়ে আছে। হঠাৎ তার মধ্যে খস্ খস্ শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। মনে হল, কে যেন খুব সাবধানে চলে বেড়াচ্ছে। বণিক মশায়ের হাতের কাছে টর্চ্ ও বন্দুক ছিল। তিনি চট্ করে উঠে বসে সেই দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখেন, হাতের মত মোটা প্রকাণ্ড এক ফারডিঙ্গা সাপ চক্ চক্ করে উঠ্‌ল। এই সাপগুলো ভয়ানক বিষাক্ত। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কোন লোক সামনে দিয়ে গেলে, তাকে ছোবল দেয়। সাপগুলো ইঁদুরের খুব ভক্ত। বোধ হয় ইঁদুর খুঁজতে বেরিয়েছে। আলো দেখে, সাপটা একটু হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষেপে উঠ্‌ল। বণিক মশায় পিণ্টো ও জংলীটাকে এক ঠেলা দিয়ে চীৎকার কর্‌তে লাগলেন, "সাপ—সাপ—ওঠ—"

তারা দুজনে স্প্রীংয়ের মত লাফিয়ে উঠ্‌তে না

উঠ্‌তে সাপটা সেইখানেই এক ছোবল দিলে। মাটিতে তার দাঁত বসে গেল।

ওদিকে অন্য জংলীরা ততক্ষণে জেগে উঠেছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাপ মারবার ধুম্‌ পড়ে গেল। বড় বড় মশাল জ্বলে উঠ্‌ল। সকলের হাতে তীর, ধনুক, বর্শা—রীতিমত যুদ্ধের সাজ আর কি! কিন্তু তাদের অস্ত্র ও উদ্যম ব্যর্থ করে দিয়ে সাপটা জঙ্গলে গা ঢাকা দিলে।

তবুও বণিক মশায়রা ভয়ে আর ঘুমোতে পারলেন না। কোথা দিয়ে আবার সাপ আসবে কে জানে?

পরদিন ভোর বেলা রওনা হবার সময় পিণ্টো বললে, "কর্ত্তা, আবার জ্বর এসেছে।"

বণিক মশায়ও অসুস্থ বোধ করছেন। জংলীটাও কি জানি কেন বলে বস্‌ল, সে আর যেতে পারবে না, সেখান থেকেই বাড়ী ফিরবে।

এখান থেকে এক মাইল দূর দিয়ে আমেজন নদীর একটি শাখা বয়ে চলেছে। এ গ্রামের জংলীরা কেউ কেউ সেখানে মাছ ও কাছিম ধরতে যায়। জন কয়েকের ক্যানো আছে। বণিক মশায় সর্দ্দারকে

বল্লেন, “নদী পথে আমাদের যদি শহরে পৌঁছে দাও, বখ্‌শিশ্‌ দেব।”

সর্দ্দার রাজী হল। কিন্তু যে জংলীটা বণিক মশায়দের সঙ্গে এসেছিল, সে এতে খুশী হল না, সর্দ্দারের ওপর মনে মনে চটে গেল। আসলে লোকটার উদ্দেশ্য বণিক মশায়দের কাছ থেকে বেশী কিছু আদায় করা। বণিক মশায় তার মনের কথা কতকটা বুঝ্‌লেও আর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয় দেখে নৌকোয় যাবার বন্দোবস্ত করলেন। তিনি জংলীটাকে বখ্‌শিশ্‌ দিতে গেলে, লোকটা প্রথমে তা নিতে চাইল না। শেষে কি ভেবে তাতেই রাজী হয়ে টাকা কয়টি নিয়ে চলে গেল।

তারপর পিণ্টোকে নিয়ে বণিক মশায়ও রওনা হলেন। সঙ্গে রইল চারজন জংলী। তাঁরা নদীর ধারে গিয়ে ক্যানোয় উঠ্‌লেন। জংলীদের দাঁড় বাইতে হল না; নদীর খরস্রোতে ক্যানোখানা ভেসে চলল। বণিক মশায় বসে বসে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্ত

ওদিকে সেই জংলীটার মাথায় কুমতলব এসেছে।

সে তার গ্রামে ফিরে গেল না। ঐ নদীর ধারে ক্রোশ কয়েক দূরে এক গ্রামে একদল জংলী বাস করত। তারা এই গ্রামের জংলীদের পরম শত্রু। উভয় পক্ষে মাঝে মাঝে যুদ্ধ হ'ত। সেইজন্য উভয় পক্ষই পরস্পরকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চল্‌ত। ঐ গ্রামের কিছু আগেই নদীটা আবার দু'ভাগ হয়ে বহু ক্রোশের পর আমেজনে মিশেছে। পথ-প্রদর্শক জংলীটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে সেই গ্রামে গিয়ে খবর দিলে, তাদের পরম শত্রুরা খুব একটা লাভের জিনিস নিয়ে সেই দিকে আসছে।

খবরটা শোনা মাত্র সারা গ্রামে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। পাঁচখানা ক্যানো তৈরী হ'ল। প্রত্যেক ক্যানোতে চারজন করে জংলা। সকলেই সশস্ত্র। তারা প্রাণপণে বৈঠা মেরে উজিয়ে চল্‌ল। দুটি বাঁক ছাড়িয়েই তারা সকলে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ঐ যে যায়—চালাও—চালাও—জোরে—"

জল কেটে, ঢেউ তুলে, তাদের ক্যানো ছুটে চলেছে।

বণিকমশয়রাও তাদের দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তখন সেই উপনদীটাতে ঢুকে পড়েছেন।

তাঁদের মাল্লারাও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। তখন সেই দিকেই জোরে বাতাস বইছে। তারা পাল তুলে দিলে। বণিক মশায় ও পিণ্টো বন্দুক পেতে প্রস্তুত হয়ে বসেছেন।

"ঐ আসছে—ঐ—ঐ—" বল্‌তে বল্‌তে বণিক মশায়রা একটা বাঁকের আড়ালে এসে পড়্‌লেন। আর তাদের দেখা যাচ্ছে না।

"পালের সঙ্গে বৈঠা মার—মাঝি—"

মাঝিও সেকথা ভাবছিল। দুজন মাল্লা বৈঠা নিয়ে বস্‌ল। নৌকোখানা যেন উড়ে চলেছে। নীচে জলের সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। তীরের গাছপালা যেন পাখ্‌না মেলে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত করেও তাদের ছাড়াতে পারা গেল না। তারাও বাঁকের আড়াল থেকে তীর বেগে বেরিয়ে এল।

দু'খানা ক্যানো ছিল সকলের আগে। সেই দু'খানাতেই পাল ছিল। বণিক মশায় আর তাদের কাছে আসতে দিলেন না। তিনি বন্দুক তুল্‌লেন—পিণ্টোও তাঁর সঙ্গে বন্দুক তুল্‌লে। গুড়ুম, গুড়ুম, দু'টি আওয়াজ হ'ল। পিছনের নৌকো

কিন্তু এত করেও তাদের ছাড়াতে পারা গেল না। তারাও বাঁকের আড়াল থেকে তীর বেগে বেরিয়ে এল।

দু'খানার পাল ফেঁসে তাতে আগুন ধরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকো দু'খানাও কাৎ। তাদের মাঝি-মাল্লারা সব জলে পড়ল। পিছনে যে ক্যানোগুলো, তারাও ততক্ষণে এসে পড়েছে। তারা তীর চালাতে লাগ্‌ল। কিন্তু বণিক মশায়রা ততক্ষণে তাদের পাল্লার বাইরে বাঁকের আর একটা আড়ালে এসে পড়েছেন।

কিছুক্ষণ আর কাউকে দেখা গেল না। বণিক মশায় ভাব্‌লেন—নিস্তার পাওয়া গেল।

কিন্তু একঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার তাদের দেখা গেল।

বাতাসের গতি তখন অন্য দিকে। পাল তোলা বৃথা, মাঝি পাল নামিয়ে নিলে। প্রাণপণে বৈঠা চল্‌তে লাগ্‌ল। বণিক মশায়ের মাল্লারা পালের সাহায্যে নৌকো চালিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্‌বার সময় পেয়েছিল। সেইজন্যে গায়ের জোরে নৌকো চালাতে লাগ্‌ল। লোকগুলোর শরীর বেশ বলিষ্ঠ।

পিছনের জংলীরা ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ছে। বণিক মশায়দের ধরা আর সম্ভব নয় দেখে তারা সেখান থেকেই তীর চালাতে লাগল। একটা তীর

বণিক মশায়দের হালে ও একটা নৌকোর পিছনের গলুইয়ে বিঁধে গেল; পাশ দিয়েও কয়েকটা চলে গেল। পিণ্টোর ইচ্ছা সে গুলী চালায়। কিন্তু বণিক মশায় তাকে নিরস্ত করলেন।

তারা আরও দুটো বাঁক তাঁদের অনুসরণ করে নৌকো ঘুরিয়ে ফিরে গেল!

বণিক মশায়রা ক্রমাগত চল্‌তে লাগ্‌লেন।

সন্ধ্যার দিকে মাঝি চাৎকার করে উঠ্‌ল, "ঐ যে ওরিনোকো—"

বণিক মশায় তাকিয়ে দেখ্‌লেন—সামনে বিশাল গভীর জলধারা, যেন কালির স্রোত, ব'য়ে চলেছে।

হঠাৎ তিনি শুনলেন, ষ্টীমারের বাঁশী। এ শব্দ যেন তাঁর পরিচিত!

নৌকোখানা আরও কিছুদূর গেলে দেখলেন—একটা ষ্টীমার, তার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা—কার্কে। চিনতে পারলেন তাঁর বন্ধুর ষ্টীমার। ষ্টীমারখানাও তাঁদের দিকে আসছে।

জংলীদের মনে বড় ভয় হ'ল। বণিক মশায় তাদের অভয় দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানিতে

ষ্টীমারের ক্যাপ্টেনকে ডাকতে লাগলেন। ক্যাপ্টেনও তাঁদের বাইনাকুলার লাগিয়ে দেখ্‌ছিলেন। হঠাৎ চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলে ষ্টীমারের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল। বণিক মশায় এবার চিন্‌তে পারলেন, ষ্টীমারের ক্যাপ্টেন-বেশে ডেকের ওপর তাঁর বন্ধু দাঁড়িয়ে।

তাঁদের ক্যানোখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে ষ্টীমারের গায়ে ভিড়তেই ওপর থেকে দড়ি নামিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর একটা দড়ির সিঁড়ি ঝুলে পড়ল। বণিক মশায় সিঁড়ি দিয়ে ষ্টীমারে উঠে গেলেন।

দুই বন্ধু পরস্পরকে সেখানে দেখে অবাক্।

"তুমি ?"

ক্যাপ্টেন বল্‌লেন, "আর তুমি ?"

"আমি এসেছি বেড়াতে—"

"আর আমি এসেছিলাম কাঠের সন্ধানে—"

"পেলে কিছু ?"

"হাঁ—প্রচুর অভিজ্ঞতা—"

দুই বন্ধুই হো হো কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে ডেকের

ওপর ছুখানা চেয়ারে বসে পড়লেন। পিণ্টোও ততক্ষণে উঠে এসেছে। বণিক মশায় বন্ধুর সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প করে জংলী মাঝিদের প্রচুর বখশিস্ দিলেন।

তারা খুশী হয়ে চলে গেল। ষ্টীমারও উজিয়ে চলল।

—

(৭)

তাঁরা আমেজন ধরে অনেক দূর এসে পড়েছেন। পরদিন তখন অনেক রাত। দুই বন্ধু ডেকের ওপর ডেক-চেয়ারে বসে চুরুট টানছেন, আর গল্প করছেন।

বক্তা অবশ্য বণিক মশায়; শ্রোতা তাঁর বন্ধু। বণিক মশায়রা এ কয়দিনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, বন্ধুর কাছে তার বর্ণনা করছেন।

বন্ধু গল্প শুন্‌তে শুনতে হঠাৎ বল্‌লেন, "সামনে একটা আলো দেখা যাচ্ছে না?"

বণিক মশায়ের চোখ ছিল অন্য দিকে, বন্ধুর কথায় তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সত্যই একটা আলো, কিন্তু এত ছোট যে মনে হয় জোনাকী।

আলোটা মাঝে মাঝে নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলে উঠ্‌ছে।

"এর মানে কি? জংলীদের আড্ডা?" বলে ক্যাপ্টেন একটু তাড়াতাড়ি সেদিকে ষ্টীমার চালাতে বললেন।

ষ্টীমারের কলগুলো সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে ধক্ ধক্ করে উঠ্‌ল। ক্যাপ্টেন কেবিনে গিয়ে দুটো রাইফেল এনে একটা বণিক মশায়ের হাতে দিয়ে বললেন—"গুলী ভরাই আছে। হাতে রাখ; দরকার হতে পারে।"

নদীর একধার দিয়ে ষ্টীমার চলেছে। চাঁদনী-রাত; নদীর মাঝখানটা বেশ পরিষ্কার যেথা যাচ্ছে কিন্তু ঝোপ-ঝাড়ের ও বড় বড় গাছের ছায়ায় কূল অন্ধকার।

হঠাৎ এক ঝাঁক তীর এসে ষ্টীমারের মাস্তুলে, রেলিংয়ে, নীচের ডেকের ধারে লাগ্‌ল। গোটা দুই ডেকের ওপর খট্ খট্ শব্দে পড়্‌ল।

ক্যাপ্টেন বল্‌লেন, "শীগ্‌গির সরে দাঁড়াও।"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে আবার আর এক ঝাঁক তীর এসে পড়্‌ল।

নীচে থেকে একজন খালাসী ওপরে উঠে এসে

বল্লে, "একজন খালাসী চোখে একটা তীর বিঁধে মারা গেছে—"

বণিক মশায় উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "ঐ দেখ আমাদের পিছনে এক সার ক্যানো।"

খালাসীটা বল্লে, "ঐ দেখুন, সামনেও খানকয়েক ক্যানো আস্‌ছে—"

ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন, "আহত খালাসীটাকে রোগীর ঘরে পাঠিয়ে সকলে বন্দুক নিয়ে দাঁড়াও। জন কয়েক সামনে, জন কয়েক পিছনে—"

খালাসীটা তৎক্ষণাৎ নেমে গেল।

ক্যাপ্টেন বার দুই বন্দুকের আওয়াজ করলেন। তার উত্তরে এল, পিছন থেকে সন্‌ সন করে গোটা কয়েক তীর।

বণিক মশায় বল্লেন, "আর দয়া নয় বন্ধু; এবার চালাও গুলী।"

ক্যাপ্টেন নীচেও হুকুম পাঠালেন। তৎক্ষণাৎ ষ্টীমারের ওপর ও নীচ থেকে একসঙ্গে দশটি রাইফেল গর্জ্জে উঠ্‌ল।

বণিক মশায় দেখ্‌লেন নিমেষের মধ্যে পিছনের

ক্যানোগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে; সামনের ক্যানোগুলোও সরে পড়ছে।

"ঐ দেখ কয়েকটা মাথা সামনের দিক থেকে ভেসে আস্‌ছে—" বলে বণিক মশায় একটাকে গুলী করলেন। গুলীটা অবশ্য লাগ্‌ল না। মাথাগুলো স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন বল্‌লেন, "একটা ব্যাপারের মীমাংসা এখনও হয় নি। সেই আলোটা—"

"ঐ যে। এবার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

"দেখতেই হবে ওটা কি!"

"কিন্তু আর এগিয়ে যাওয়া কি নিরাপদের?"

"বিপদের সঙ্গে লড়াই করেই আমার আনন্দ। ব্যবসাদারী করে দেখ্‌ছি তুমি সঞ্চয়ের দিকেই বেশী মন দিয়েছ, না হলে প্রাণটাকে সঞ্চয় করে রাখতে চাও কেন? ওটা কি শেষ অবধি থাকবে?"

বণিক মশায় বুঝ্‌লেন, বন্ধু তাঁকে প্রকারান্তরে কাপুরুষ বল্‌লেন। তিনি অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। তারপর বল্লেন, "দেখা যাক্ সঞ্চয়ী কে?"

"বেশ দেখে নিও—" বলে ক্যাপ্টেন চুরুট্ টান্‌তে লাগ্‌লেন।

আলোটা ক্রমে স্পষ্ট ও বড় হয়ে উঠ্‌ছে। ষ্টীমার-খানা আরও খানিক এগিয়ে গেলে, তাঁরা দেখ্‌লেন সেটা আলো নয়, আগুন।

"ঐ দেখ, কতকগুলো জংলী চলা-ফেরা করছে—" বলে বণিক মশায় সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ষ্টীমারখানা আর একটু এগিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বাইনাকুলার দিয়ে দেখে বলে উঠ্‌লেন, "কি ভয়ঙ্কর! একটা লোককে গাছের সঙ্গে বেঁধে তার সামনে রীতিমত নাচ হচ্ছে। ওরা কে? রাক্ষুসে-জংলী? হাঁ, তাই ত মনে হচ্ছে। ঐ লোকটাকে হত্যা করে, সামনের ঐ আগুনে পুড়িয়ে খাবে বোধ হয়। হায় হতভাগ্য!"

কথাটা শুনেই বণিক মশায় চম্‌কে উঠ্‌লেন। কে? কে ঐ লোকটা? তাঁরই মাঝি-মাল্লাদের একজন কি? নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে কি ভয়ানক শাস্তি ওরা পেয়েছে! তবুও বাঁচাতে হবে; নিজের প্রাণ

তুচ্ছ করেও ওকে বাঁচাতে হবে। এতে বিপদ আছে, তবুও সে বিপদে ঝাঁপ দেবার আনন্দ প্রচুর। ক্যাপ্টেনকে বললেন, "বন্ধু, সমুখে সুবর্ণ সুযোগ; মূর্তিমান মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এবার দেখ্‌ব—"

ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল। বল্লেন—"আচ্ছা।" বলেই তিনি ক্যাবিনে ঢুকে দুটো কার্টিজ বেল্ট আর দুখানা ছোরা আনলেন। একটা বেল্ট ও একখানা ছোরা বণিক মশায়কে দিয়ে বল্লেন, "শক্ত করে বেঁধে নাও।"

বণিক মশায় নিমেষে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেনের কোমরেও ছোরা, পিঠে কার্টিজ বেল্ট, হাতে রাইফেল। তিনি হুকুম দিলেন, "বাছা বাছা চারজন জোয়ান নাবিক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। আর, লাইফবোটখানা নামাও।"

তারপর তাঁর সহকারীকে বল্‌লেন, "ঐ দেখ রাক্ষসদের আড্ডা। আমরা রাক্ষসের দেশে এসে পড়েছি। এই ষ্টীমার তোমার জিম্মায় রইল। আমরা ছ'জন ঐ লোকটাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। ফিরতেও

পারি, নাও পারি। ফির্‌লে এই ষ্টীমারেই যাব, না ফির্‌লে তুমি চলে যেও”—বলে ক্যাপ্টেন সহকারীকে বিদায় দিলেন।

সহকারী যাবার সময় কেবল বল্লে, “আমায় যদি সঙ্গে নিতেন!”

“তাহলে এই দায়ীত্বভার কাকে দেব?”

সহকারী সম্মতি জানিয়ে অভিবাদন কর্‌লে।

“আর এক কথা। কোন ক্যানোকে ঐ দিকে যেতে দেবে না। তোমরা সর্ব্বদা আমাদের কাছে কাছে থাকবার চেষ্টা করবে। ষ্টীমারের সব আলো নিভিয়ে দাও”—বলে ক্যাপ্টেন বণিক মশায় ও চারজন সশস্ত্র নাবিককে সঙ্গে নিয়ে লাইফবোটে উঠ্‌লেন।

তখন বনের আড়ালে চাঁদ নেমে গেছে। চারধার অন্ধকার! ক্যাপ্টেনদের বোটখানা খুব সাবধানে অথচ দ্রুত ওপারের দিকে যাচ্ছে। ষ্টীমারখানাও প্রকাণ্ড জলজন্তুর মত নদীতে এদিক-ওদিক করতে লাগ্‌ল। সকলেই সতর্ক।

কিন্তু রাক্ষসগুলো তখনও জান্‌তে পারে নি,

তাদের পিছনে শত্রু! তারা মহা আনন্দে নৃত্য করছে।

ক্যাপ্টেন বল্লেন, "আরও জোরে দাঁড় টান। ঐ যে"—ঠিক তখনই রাক্ষসগুলো সমস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠল।

"কি হল? এত আনন্দ কিসের? লোকটাকে মেরে ফেললে?" বলে বণিক মশায় ক্যাপ্টেনের হাত থেকে বাইনাকুলারটা নিয়ে দেখতে লাগলেন। কি সর্ব্বনাশ! ওরা লোকটাকে কুড়ুল ছুঁড়ে মারছে! কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে একটা কুড়ুলও লোকটার গায়ে লাগছে না, সবগুলো পাশ দিয়ে গিয়ে গাছের গায়ে বিঁধে যাচ্ছে! আবার তাদের নাচ গান সুরু হল। বাজনা বাজছে—ধুম্-ধুম্-ধাঁই।

বণিক মশায় কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে আছেন।

বোটখানা সন্ সন্ শব্দে পারে গিয়ে পৌঁছল, কিন্তু নামবার মত জায়গা পাওয়া গেল না। কোথাও উঁচু পাড়, কোথাও জলের ওপর ঝোপ-জঙ্গল নুয়ে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন বল্‌লেন, "আর একটু এগিয়ে একেবারে ওদের ভোজের জায়গার কাছে যাওয়া যাক্।"

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই, রাক্ষসগুলো যেখানে ছিল, তাঁরা সেই জায়গাটার নীচে এসে পৌঁছলেন। বোটখানা কূলে লাগ্‌তে না লাগ্‌তে সাম্‌নের ঝোপের আড়াল থেকে চার পাঁচটা পেঁচা যেন ডাক্‌তে ডাক্‌তে চলে গেল। ওদিকে তৎক্ষণাৎ নাচ-গানও বন্ধ হল। বেশ বোঝা গেল, রাক্ষসরা পালাতে সুরু করেছে।

ক্যাপ্টেন বল্লেন, "শীগ্‌গির নাম। ওরা টের পেয়েছে। এখনি বন্দীকে নিয়ে গহন বনে পালাবে; আমাদের সাধ্যও হবে না যে খুঁজে বার করি।"

একজন নাবিক ক্ষিপ্রহাতে একখানা লগি পুঁতে বোটখানাকে তার সঙ্গে বেঁধে ফেল্‌লে। ইতিমধ্যে বণিক মশায়রা সকলে তীরে নেমে ঝোপ ঠেলে সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটছেন, সকলের আগে তিনি।

"শীগ্‌গির—শীগ্‌গির। ঐ ওরা লোকটার বাঁধন খুল্‌ছে"—বলে বণিক মশায় আরও জোরে ছুট দিলেন।

কিন্তু দশ পা গিয়েই তাঁর পা দুখানা কিসে যেন আটকে গেল। তিনি মুখ থুব্‌ড়ে একটা কাঁটা ঝোপের ওপর হুড়্‌মুড়্‌ করে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর হাত-পা-গা কাঁটায় ছড়ে রক্তাক্ত। কিসে আটকে যে তিনি এমন দুর্দ্দশায় পড়লেন, তখন সে কথা ভাববার সময় নেই। তিনি সব জ্বালা-যন্ত্রণা তুচ্ছ করে তৎক্ষণাৎ উঠে আবার ছুট্‌তে স্থরু করলেন।

তাঁর পিছনেই ক্যাপ্টেন-বন্ধু ও নাবিকের দল। তাঁদের মনে হয়েছিল, বণিক মশায় বুঝি তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেছেন আর তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তাঁরা সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই তাঁকে উঠ্‌তে দেখে সকলে জয়ধ্বনি করে উঠ্‌লেন।

ততক্ষণে জংলীরা লোকটার বাঁধন খুলে ফেলেছে। লোকটাকে নিয়ে পালাবে—অমনি ক্যাপ্টেনের রাইফেলের আওয়াজ হল—'দুম্'। একটা রাক্ষস পড়ে গেল; কিন্তু বাকী রাক্ষসগুলো বন্দীকে নিয়ে পালাচ্ছে। তারা বণিক মশায়দের কাছ থেকে মাত্র গজ পঞ্চাশেক দূরে। তাঁদের দুজনের কোমরে তেজী টর্চ্‌ ছিল; সেইদিকে টর্চ্‌ ফেল্‌তেই সোঁ করে

ছুটো রাক্ষস দু'খানা ঝক্‌ঝকে কুড়ুল তুলে বন্দী লোকটার মাথায় মারলে।

দুটো তীর এসে টর্চ দুটোর কাচ ও বাল্‌ব্ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে।

উত্তরে এবার বণিক মশায়ের রাইফেল গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, পর পর দুবার।

ক্যাপ্টেন বল্লেন, "শীগগির বসে পড়। ওরা তীর চালাচ্ছে।"

সামনে ফাঁকা জায়গা। কিছু দূরেই সেই গাছটা ও আগুনের কুণ্ড। তার শিখা নিভে এসেছে কিন্তু আগুন তখনও জ্বল্‌ছে। তার ম্লানালোকে সকলে দেখ্‌লেন, দুটো রাক্ষস দু'খানা ঝক্‌ঝকে কুড়ুল তুলে বন্দী লোকটার মাথায় মারলে।

সকলের মুখ থেকে হাহাকার বেরিয়ে এল— "হায়! হতভাগ্য!"

লোকটা তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়ল। কিন্তু সে একাই ঢল্‌ল না; দুজন নাবিকের গুলীতে সেই রাক্ষস দুটোও কাটা তালগাছের মত লুটিয়ে পড়ল।

"এবার চালাও। আর আমাদের সাবধান হবার দরকার নেই"— বলে ক্যাপ্টেন অন্ধকারে গুলী

চালাতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে বণিক মশায় ও নাবিকরাও যোগ দিলেন। তাঁরা চারধারে গুলা চালাচ্ছেন এবং তার উত্তরে আসছে এক এক ঝাঁক তীর—কখনও ডান দিক থেকে, কখনও বাম দিক থেকে, কখনও সমুখ থেকে। ক্রমে তীরের সংখ্যা কমে আস্‌তে আস্‌তে একেবারে থেমে গেল। কেবল সেই অন্ধকারের মাঝ থেকে আর্ত্তনাদ, অগ্নি-কুণ্ডের চট্‌পট্‌ ও আমেজনের ছল্‌ ছল্‌ শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল।

বণিক মশায়রা সেই লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখেন—তার মৃত্যু হয়েছে।

বাণক মশায় একটা ছোট ডাল জ্বালিয়ে লোকটার মুখের ওপর তুলে ধরলেন। তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট সহানুভূতির কথা শোনা গেল—"বেচারা মাঝি!"

হঠাৎ ক্যাপ্টেন বল্লেন,—"ঐ শোন, বন্দুকের শব্দ হচ্ছে।" তাঁর কথা শুনে সকলে কানখাড়া করে শুন্‌তে লাগ্‌লেন—তাইত। মনে হচ্ছে, তাঁদের ষ্টীমার বিপন্ন হয়েছে।

"চল—চল—"

ক্যাপ্টেন বল্লেন, "কোথা যাবে ? ওর চারধারে নিশ্চয়ই এখন শত্রু ভরা ক্যানো। সে ব্যূহ ভেদ করে ষ্টীমারের কাছে যাওয়া কেবল দুঃসাধ্য নয়, নিশ্চিত মৃত্যু। তার চেয়ে প্রত্যেকে একটা করে মোটা ডালে আগুন ধরিয়ে নাও।"

"কি হবে ?"

"পরে বলব। আর সময় নষ্ট করো না। এখানকার শত্রু এখন অন্ততঃ এক মাইল দূরে পালিয়েছে। তাদের কাছ থেকে শীঘ্র বিপদের সম্ভাবনা নেই।"

ক্যাপ্টেনের কথামত সকলে রাক্ষসরা যে ডাল-গুলো স্তূপীকৃত করে রেখেছিল, তা থেকে এক একটা ডাল নিলেন। তারপর সেই আগুনে জ্বেলে মশালের মত হাতে নিয়ে বোটের দিকে এগোতে লাগলেন।

"ঐ যে আবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—"

বণিক মশায়রা একরকম ছুট্তে ছুট্তে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু বোট কৈ ?

তাঁরা নীচে নেমে গেলেন। না, বোট নেই ত !

একজন নাবিক কাদার ওপর ঝুঁকে জ্বলন্ত ডালটা তার ওপর ধরে বলে উঠ্‌ল, "এই দেখুন, পায়ের দাগ। খালি পা, নিশ্চয়ই রাক্ষসদের। তারা আমাদের নৌকো চুরি করে নিয়ে গেছে।"

ক্যাপ্টেন বণিক মশায়কে বললেন, "বন্ধু, এবার আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছ? ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। কিন্তু বীর যারা তারা সহজে হাল ছাড়ে না। সকলে মশালগুলো ঘন ঘন মাথার ওপর ঘোরাও।"

তাঁদের মাথার ওপর ফুল্‌কী ছাড়তে ছাড়তে বড় বড় আগুনের চাকার মত মশালগুলো ঘুরতে লাগ্‌ল।

"ঐ শোন বাপ্‌ বাপ্‌ বৈঠার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। খানকয়েক শত্রুর ক্যানো আমাদের দিকে আসছে"—বলে বণিক মশায় একটু হাসলেন।

"আবার ঐ শোন আমার 'কার্কের' চাকার শব্দ। ওরাও আমাদের দিকে আসছে"—বলে ক্যাপ্টেন এমন এক সুতীক্ষ্ণ ও সুদীর্ঘ শিষ্‌ দিলেন যে মনে হল, কানের পর্দ্দা ফেটে যাবে। সে স্বর গাছের ওপর

দিয়ে, জলের ওপর দিয়ে আকাশের বহু ঊর্দ্ধে উঠে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

এবার বৈঠার আওয়াজ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; লোকের গলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। ষ্টীমারের এঞ্জিনও করছে ধ্বক্ ধ্বক্—ধ্বক্ ধ্বক্—ধ্বক্ ধ্বক্। হঠাৎ তার গম্ভীর বাঁশী বেজে উঠ্‌ল।

ক্যাপ্টেন বন্দুকের আওয়াজ করলেন; মশাল-গুলো প্রায় অগ্নি শূন্য হয়ে এসেছে, তবুও বারুদহীন চরকা-বাজীর মত ঘুরতে লাগ্‌ল।

ক্যাপ্টেন আবার বন্দুকের আওয়াজ করলেন।

"ঐ যে ষ্টীমার—"

ষ্টীমারখানা একেবারে সামনে এসে গেছে। কিন্তু ক্যানোগুলো কোথা গেল? নিশ্চয় কাছেই কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছে। হয়ত এখনই লোকগুলো ডাঙায় উঠে পিছন থেকে আক্রমণ করবে।

ক্যাপ্টেন আবার শিষ্ দিলেন। ষ্টীমার থেকে তার উত্তর ফিরে এল—"হুইও—"

তারপরই ষ্টীমারখানা তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল।

ক্যানোর লোকগুলোও ততক্ষণে ডাঙায় নেমে পড়েছে। তারা ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে ক্ষুধার্ত্ত জাগুয়ারের মত বণিক মশায়দের দিকে ছুটে আসতে লাগল। হয়ত মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তাঁদের ওপর এসে পড়বে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ষ্টীমারও এসে তীরে লাগল। ক্যাপ্টেনরা তখনই ষ্টীমারে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে কলগুলো পূর্ণোদ্যমে ঝক্ ঝক্—ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ করে উঠ্‌ল ; ষ্টীমার চল্‌তে স্নরু করেছে।

ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন—"স্রোতের মুখে ফিরাও ; দেখি কার্কের কাছে কে আসে—"

কার্ক স্রোতের মুখে ফিরে পূর্ণগতিতে ছুটে চল্‌তে লাগ্‌ল—দূরে বহুদূরে সেই সভ্য-মানুষের বসতির দিকে। তার দুপাশে পড়ে রইল শ্বাপদসঙ্কুল ও ক্রুদ্ধ রাক্ষসপূর্ণ ব্রেজিলের গহন বন !